ইসলাম কী?

শেইখ মুহাম্মাদ কারাকুন্নু

অনুবাদ - ইমাম হোসেন

ইসলাম কী ?

মূলঃ শেইখ মুহাম্মাদ কারাকুন্নু

অনুবাদ : ইমাম হোসেন

যুব প্রত্যাশা প্রকাশনী

১৪, আলিমুদদ্দিন স্ট্রীট, কলকাতা-১৬

ইসলাম কী?

মূল: শেইখ মুহাম্মাদ কারাকুন্নু

অনুবাদ : ইমাম হোসেন

প্রকাশনায়

যুব প্রত্যাশা প্রকাশনী

১৪, আলিমুদ্দিন স্ট্রীট (২য় তলা), কলকাতা-১৬

ফোন নং- ০৩৩ ২২৬৪ ৫৯৫২

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৩

দাওয়াহ সংস্করণ (বিক্রয় যোগ্য নয়)

মুদ্রণেঃ ডায়মন্ড আর্ট প্রেস

প্রচ্ছদ: আযম হোসেন খান | পৃষ্ঠা সজ্জা: সাবিরুল ইসলাম

বানান ও ভাষারীতি: উমার আলি মোমিন

সম্পাদনা: মুহাম্মাদ মুরসালিম

WHAT IS ISLAM?

Written by Seikh Muhammad Karakannu

Translated by Imam Hossain

Published by Yuba Pratyasha Prakashani
14, Alimuddin Street (2nd Floor), Kol-16

Printed by Diamond Art Press
Benting Street, Kolkata

Phone: (033) 2264 5952

First Edition: September 2025

Dawah Edition (Not for Sale)

প্রকাশকের কথা

'ইসলাম কী?' মালয়ালাম ভাষায় শেইখ মুহাম্মাদ কারাক্কুনু রচিত এক অনন্য গ্রন্থ। ইসলামের মৌলিক বার্তার সৌন্দর্য ও গভীরতাকে সামনে রেখে আমরা একে ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছি। অনূদিত ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহ ও পাঠকের সহজাত অভিব্যক্তি রক্ষার পাশাপাশি মূল গ্রন্থের অন্তর্নিহিত স্পিরিট ধরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে জীবনের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে: আমরা কারা? কেন আমাদের পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমাদের গন্তব্য কী? লেখক যুক্তির স্বচ্ছতা, প্রাণবন্ত উদাহরণ এবং কালজয়ী প্রজ্ঞার আলোকে পাঠককে ইসলামী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির (Islamic worldview) মূল স্রোতে টেনে আনেন; যেখানে মানবতার ঐক্য, জীবনের পবিত্রতা, ন্যায়বিচারের সাধনা এবং স্রষ্টার প্রতি সচেতন আত্মসমর্পণের আহ্বান নিহিত রয়েছে।

'ইসলাম কী?' আধুনিক ভ্রান্ত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, কুসংস্কার ও বস্তুবাদকে চ্যালেঞ্জ জানায় এবং এমন এক বিশ্বাসের আকর্ষণীয় রূপ তুলে ধরে যা কেবল আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ, প্রাণময় জীবনব্যবস্থা। এটি পাঠককে চিন্তাশীলতা, কৃতজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের দিকে আহ্বান করে। পাশাপাশি, এক অশান্ত ও অস্থির পৃথিবীতে অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং বাহ্যিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ইসলামী দিকনির্দেশনাও সহজভাবে উপস্থাপন করেছে এ গ্রন্থ।

আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানায় BSM Trust (Panoor, Kerala)-এর নিবেদিতপ্রাণ দলকে তাদের উদার সমর্থনের জন্য। এই কাজটি সত্য অনুসন্ধানকারীদের বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছানোর জন্য তাদের অমূল্য প্রচেষ্টার জন্য কেরালার ডায়ালগ সেন্টারের প্রতিও আমরা সমানভাবে কৃতজ্ঞ। পাশাপাশি বাংলা ভাষায় এই বইটিকে নিয়ে আসার জন্য যিনি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন সেই শ্রদ্ধেয় আকতার হোসেন ভাই এবং অনুবাদক ইমাম হোসেন ভাইয়ের প্রতিও আমরা চির কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি পাঠকের অন্তরে ইসলামের সৌন্দর্যের এক ঝলকও ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়, তবে আমরা আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করব।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সকলের উপর তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করুন!

অনুবাদকের কথা

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতির উপর অনেক বই পড়েছি, দেখেছি। বিশেষ উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট ও শ্রোতাদের সামনে রেখে বইগুলো লেখা হয়েছে। নিজ নিজ অবস্থানে বা আঙ্গিকে প্রত্যেকটা বইয়ের যথাযথ মূল্য বা তাৎপর্য রয়েছে। এটা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করছি। তবে বক্ষমান অনূদিত বইটি ভারতীয় বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন সংযোজন। সৃষ্টিকর্তা, তাঁর বিধান ও মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সহজ সরল অথচ যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের সংমিশ্রণে ফুটিয়ে তুলেছেন ইসলামের এক জীবন্ত, চিত্তাকর্ষক প্রতিচ্ছবি। ভারতীয় জনমানসের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তুলে ধরেছেন নানান যৌক্তিক ও বাস্তব ঘটনাবলী। একজন পাঠক নিরপেক্ষ নির্ভেজাল মন নিয়ে বইটি অধ্যয়ন করলে, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও, ইসলামের একটি সুসংহত ধারণা অর্জন করবেন বলে আমার বিশ্বাস। আকতার হোসেন (মালদা) ভাইয়ের প্রস্তাব ও নির্ভেজাল তাগিদ বইটি অনুবাদে টনিকের মত কাজ করেছে। আমি ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ক্ষুদ্র একজন অনুবাদক হিসেবে, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নতুন আঙ্গিকে রচিত এ ধরনের বই অনুবাদ করতে পেরে আল্লাহ তাআ'লার বিনম্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি মূলত বইটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছি। অনুবাদে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কিছুটা সাহায্য নিয়েছি। অনুবাদে যেকোনও দুর্বলতা একান্তই আমার। এবং তার জন্য আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমা চাইছি।

বইটি প্রকাশ করার জন্য 'যুব প্রত্যাশা প্রকাশনীর' কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করি, পশ্চিমবাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের মাঝে ইসলামের ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের পরিশ্রম ও উদ্যোগ কবুল করে নিন। আমিন!

ওয়াস সালাম

ইমাম হোসেন

মুর্শিদাবাদ

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ৯
আমরা কারা? ১১
জীবনের দুটি দিক ১৫
মালিকানা ১৬
আমাদের সীমাবদ্ধতা ১৭
ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ক্ষমতা ২০
কার উপসনা করা হবে? ২১
ন্যায়বিচার ২২
মৃত্যুর পর ২৪
তিনটি সম্পর্ক ২৮
ধর্মের মানবতা ৩৩
ছিন্নভিন্ন পারিবারিক বন্ধন ৩৫
স্বার্থপরতার অবসান ৪১
মানবতার ঐক্য ৪৩
মনের শান্তির পথ ৪৯
পবিত্রতার পথ ৫৩
ইসলাম সকলের ৫৫

মুখবন্ধ

কেরালার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের নিকট ইসলামকে তুলে ধরার জন্য মুখোমুখি অনুষ্ঠান (ফেস টু ফেস) এবং উন্মুক্ত আলোচনার (ওপেন সিরিজ) একটি সিরিজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের সকল স্তরের মানুষ গভীর আগ্রহ ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন এইসব আলোচনায়। এই অধিবেশনগুলি ইসলামের একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দিয়ে শুরু হত এবং তারপর শ্রোতাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরের মধ্য দিয়ে শেষ হত। এই আলোচনার বিষয়বস্তু 'দৈবম, মাতমম, বেদম - স্নেহ সংবাদম' শিরোনামে সংকলিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষমান গ্রন্থ, 'ইসলাম কী?' হল সেই অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত ভূমিকামূলক বক্তৃতার সংকলন, যার লক্ষ্য ইসলামের একটি সাধারণ ধারণা জনতার মধ্যে প্রদান করা। এই সংক্ষিপ্ত বইটি পাঠকদের ধর্ম সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জনে সহায়তা করবে এই প্রত্যাশায় সাজানো হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি, যা এক বসায় পড়া যায়, আজকের বিশ্বে বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য বহন করে। আমার আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা যে, এই গ্রন্থটি ইসলাম বুঝতে আগ্রহীদের জন্য একটি কার্যকর সম্পদ হিসেবে কাজ করবে ইনশা আল্লাহ।

আমরা কারা?

মানুষ কে অর্থাৎ মানুষের পরিচয় কী? সে কোথা থেকে এসেছে? সে কোথায় যাচ্ছে? জীবন কী? উদ্দেশ্যই বা কী মানুষের জীবনের? জীবন কীভাবে পরিচালনা করা উচিত? মৃত্যুর পরে কী ঘটে? যে বা যারা সচেতনভাবে জীবনকে উপলব্ধি করতে চায় তার বা তাদের জন্য প্রশ্নগুলো অনিবার্য। উপরে উল্লেখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর একজন ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য, উপায়-উপকরণ, দিকনির্দেশনা, পদ্ধতি, রূপ বা ধাঁচ এবং অভিজ্ঞতা নির্ধারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একজন মানুষের সত্তা তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত: শরীর, মন ও আত্মা। মানুষের মতো, অন্যান্য জীবেরও দৈহিক ও শারীরিক চাহিদা আছে। সকল জীবই এই চাহিদাগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে - খাওয়া-দাওয়া, পান করা, ভোগ করা, এবং আনন্দ খোঁজা। তাদের ইন্দ্রিয়, যা নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করে, তাদের এই পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতে সহায়তা করে। কিছু কিছু দিক দিয়ে, কিছু প্রজাতির শারীরিক ক্ষমতা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এখানে মৌমাছির কথা বলতে পারি। এটি পরিচালনা করার জন্য সূর্যালোকের প্রয়োজন হয় না। একটি প্রস্ফুটিত ফুলের কাছে দাঁড়িয়ে একজন অত্যন্ত সুদক্ষ উদ্ভিদবিদ কখন সবচেয়ে বেশি ফুলের মধু ধারণ করে তা নির্ধারণ করার জন্য লড়াই করতে পারেন। কিন্তু একটি মৌমাছি উড়ে বেড়াতে বেড়াতে অনায়াসে মধু শনাক্ত করতে পারে। যখন মধুযুক্ত ফুল পাওয়া যায়, তখন মৌমাছি একটি বিশেষ নৃত্যের মাধ্যমে অন্যান্য মৌমাছিদের সেসম্পর্কে অবহিত করে। যদি মধুর উৎস ১০০ মিটারের বেশি দূরে থাকে, তা হলে মৌমাছি চিত্র-আট প্যাটার্নে একটি ওয়াগল নৃত্য পরিবেশন করে। এই নৃত্য অন্যান্য মৌমাছিদের উপরের লুপের কোণের উপর ভিত্তি করে ফুলের মধুর দূরত্ব এবং দিক উভয়ই নির্ধারণ করতে সহায়তা করে! আর

যদি মধু ১০০ মিটারেরও বেশি দূরত্বে থাকে, তবে মৌমাছিটি একটি বৃত্তাকার নৃত্য পরিবেশন করে। কোনও রকমের সরঞ্জাম ছাড়াই উড়তে এবং অন্যদের সঙ্গে যথাযথ যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মৌমাছির দক্ষতা সত্যিই অসাধারণ। মৌমাছির মৌচাক নিজেই কারিগরি দক্ষতার একটি অবিশ্বাস্য উদাহরণ — যা একজন দক্ষ প্রকৌশলীও প্রতিলিপি হিমশিম খেতে পারেন। তদুপরি, একটি মৌমাছির চাকের মধ্যে কাজের বিভাজন একটি অত্যন্ত সংগঠিত মানব সমাজের চাইতেও আরও বেশি দক্ষ।

উইপোকা দ্বারা নির্মিত উইপোকার কাঠামোটিও অনুরূপ চিত্তাকর্ষক। এই কাঠামোগুলি উচ্চতায় ২৫ ফুট পর্যন্ত উচুঁ হতে পারে এবং তার মধ্যে একাধিক নিরাপদ কক্ষ থাকতে পারে। একটি উইপোকার আকারকে তার ঢিবির উচ্চতার সাথে তুলনা করলে, যদি মানুষ একটি আনুপাতিক ভবন তৈরি করতে চায়, তা হলে এটি কমপক্ষে ১,০০০ তলা লম্বা হতে হবে। বিভিন্ন প্রাণীর শারীরিক ক্ষমতা সত্যি আশ্চর্যজনক। একটি ব্যাঙ তার শরীরের দৈর্ঘ্যের ২০ গুণ পর্যন্ত লাফ দিতে পারে, অন্যদিকে একটি ঘাস ফড়িং তার আকারের ২০০ গুণ বেশি লাফ দিতে পারে যা আদতে খুবই আশ্চর্যজনক। তুলনা করে দেখলে দেখা যাবে, যদি একজন মানুষের একই ক্ষমতা থাকত, তা হলে তারা এক সীমানায় কমপক্ষে ৪০০ মিটার লাফ দিতে সক্ষম হত। আর এটি হত একটি অকল্পনীয় কীর্তি! পরিযায়ী পাখিরা সহজাতভাবে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে উপযুক্ত জলবায়ু খুঁজে নিতে পারে যখন তাদের আবাসস্থলের পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে পড়ে। স্ত্রী পতঙ্গ তাদের সেন্ট (সৌরভ) ব্যবহার করে ১১ কিলোমিটার দূর থেকেই পুরুষদের আকর্ষণ করতে পারে। ড্রাগনফ্লাইয়ের উড়ান ক্ষমতা, যা নির্ভুলতার সাথে সামনে, পিছনে এবং এদিক-ওদিক যেতে পারে, সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরন্তু, বিড়ালের দৃষ্টিশক্তি, কুকুরের শ্রবণশক্তি এবং ঈগলের দৃষ্টিশক্তি, সবই মানুষের চেয়ে অনেক বেশি!

উত্তর মেরু অঞ্চলের টার্ন (এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি) - এর স্বাভাবিক নৌচলাচল (পানিতে চলাচল) দক্ষতা অসাধারণ। এই সামুদ্রিক পাখিরা উত্তর মেরু অঞ্চলে অঞ্চলে বাস করে, যেখানে শীতকালে তুষারপাত তাদের খাদ্যের জন্য নির্ভরশীল

ঘাসের বীজকে ঢেকে রাখে। যখন খাবারের অভাব দেখা দেয়, তখন তারা এক অবিশ্বাস্য যাত্রা শুরু করে। প্রায় ১৭,০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সুদূর অ্যান্টার্কটিকের দিকে ছুটে যায়। পুরুষ পাখিরা প্রথমে পরিযান করে, তারপরে স্ত্রী পাখিরাও তাদের পিছু ধরে। অ্যান্টার্কটিকায় একবার যাওয়ার পরে যেখানে পরিস্থিতি অনুকূল থাকে, তারা প্রচুর পরিমাণে খাবার খায় এবং ডিম পাড়ে। বাচ্চারা বড় হওয়ার সাথে সাথে, প্রত্যাবর্তন শুরু হয় তাদের। প্রথমে নবজাতক শাবকগুলি চলে যায়, তারপরে স্ত্রী শাবকগুলি এবং অবশেষে পুরুষ শাবকগুলি পরিযান শুরু করে। একজন মানুষের জন্য, এমনকি কেরালা (বা কলকাতা) থেকে দিল্লিতে পৌঁছানোও ৩,০০০ কিলোমিটারেরও কম পথ - হারিয়ে না গিয়ে - গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোটা যাত্রীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হবে। এরপরও উত্তর মেরু অঞ্চলের টার্ন (এক ধরনের সামুদ্রিক পাখি) কোনও রকম ভুল ছাড়াই ছয়গুণ দূরত্বর পথ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়।

ইউরোপীয় সমুদ্রের আদি নিবাস অ্যারেল মাছটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার যাত্রা শুরু করে। সারগাসো সাগরে (শৈবাল সাগর) পৌঁছাতে দীর্ঘ তিন বছর সময় লাগে, যেখানে মাছটি তার বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। যাইহোক, এর বংশধররা প্রবৃত্তিগতভাবে একই পথ অনুসরণ করে আবার ইউরোপীয় জলসীমায় ফিরে যায়। তারা তিন বছরের মধ্যে যাত্রা শেষ করে কিন্তু পথ হারায় না, ভুল করে না।

মানুষের মতো, অন্য কোনও প্রাণী তার সহজাত প্রবৃত্তির স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করতে পারে না। ফলস্বরূপ, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং অগ্রগতি তাদের কাছে অগম্য, অধরা। মধু মৌমাছিরা আজও তাদের মৌচাক তৈরি করে চলেছে ঠিক যেমন তারা হাজার হাজার বছর ধরে একই কাজ করে আসছে। পাখিরা এখনও একই গতিতে উড়ে যেমন শত শত বছর আগেও আকাশে উড়ত। উল্টোদিকে, মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তাদের সঞ্চিত জ্ঞান এবং অগ্রগতির মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি, উন্নতি সাধন করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা একসময় গুহায় বাস করতেন, তারপর পাতা দিয়ে তৈরি ছোট ছোট কুঁড়েঘরে বাস করতেন। সময়ের সাথে সাথে, তারা ঘাসের ছাদ দিয়ে ঘর, থাকার জায়গা তৈরি করতেন। তারপরে সাদামাটা, সরল সহজ ঘর তৈরি করতেন। আজ, আমরা সিমেন্টের তৈরি

মজবুত ঘরে, অট্টালিকায় বাস করি। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কী ধরণের বাসস্থান তৈরি করবে তা কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবে না। অনুরূপভাবে, আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়ত উড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা অর্জনের স্বপ্নও দেখতে পারেননি। আর এখন, আমরা এমন প্রযুক্তি তৈরি করেছি যা আমাদেরকে যেকোনও পাখির চেয়ে অনেক বেশি গতিতে আকাশে ভ্রমণ করতে সক্ষম করে তুলেছে। সবকিছুই সম্ভব হয়েছে মানুষের বুদ্ধিমত্তার দ্বারা - আমাদের চারপাশের পৃথিবী পর্যবেক্ষণ, শেখা এবং বোঝার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। আজও জানা-বোঝার এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত।

তবে, বুদ্ধিমত্তাই মানবজাতির একমাত্র সিদ্ধান্তসূচক বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের মধ্যে তাদের নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার অনন্য ক্ষমতা রয়েছে, যা অন্য কোনও জীবন্ত প্রাণী করতে পারে না। একটি ক্ষুধার্ত গরুকে ঘাস দেওয়া হলে, সে খাস না খেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ক্ষুধার্ত গরু আগে খাবে বলে অপেক্ষা করার ক্ষমতা গরুর নেই। একটি পিপাসিত কুকুর, জল পেলে, অন্য কুকুরের জন্য তা আলাদা করে রাখতে পারে না। একটি মোরগ, যদি উত্তেজিত হয়, তা হলে সে অবিলম্বে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনা দ্বিধায় আক্রমণ করবে। কিন্তু ঠিক উল্টোদিকে, মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ আছে। একজন ক্ষুধার্ত মানুষ, তার সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও, সে খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে। এমনকি তৃষ্ণায় কাতর হয়েও, পানি পান করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, একজন ব্যক্তি পানি পান করা থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারবে । যে ব্যক্তি কথা বলতে বাধ্য মনে করে, সে তার সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বা পরিণতির ভয়ে চুপ থাকতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সহজতা ঝোঁক-প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ এবং নিজের ইচ্ছাকে আয়ত্ত করার এই ক্ষমতা মানুষের একটি মৌলিক মানবীয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ। আধ্যাত্মিক উপাদানই আমাদের মধ্যে এই ধরনের শৃঙ্খলা তৈরি করে। অতএব, প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য প্রাণীর বিপরীতে, মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রাকৃতিক (সহজাত) ইচ্ছা, প্রবৃত্তির দ্বারা আবদ্ধ নয়। মানব জীবনের দুটি দিক আছে: প্রথমত, ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্র এবং পছন্দ করার ক্ষমতা; দ্বিতীয়ত, প্রবৃত্তির ক্ষেত্র, যা সেই স্বাধীনতা ছাড়াই বিদ্যমান।

জীবনের দুই দিক

আমাদের দেশ, বাড়ি, ভূমি, ভাষা, সময়, ঐতিহ্য এবং পরিচয় - এগুলোর কোনটিই আমাদের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করব বা কোন সংস্কৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পাব তা আমরা বেছে নিই না। আমরা লম্বা হব না খাটো হব, মালয় (বাঙালি - অনুবাদক) হব না তামিল হব, কালো হব না সাদা হব, পুরুষ হব না মহিলা হব, এমনকি আমরা বিংশ না একবিংশ শতাব্দীতে বাস করব তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা আমাদের দেওয়া হয়নি। এই সকল দিক স্রষ্টার অপরিবর্তনীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সীমাবদ্ধতার এই দিকসমূহের পাশাপাশি, সম্ভাবনার একটি বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মানুষের নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আছে। আমরা কী খাব আর কী খাব না, কী পান করবো আর কী এড়িয়ে চলব - তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের আছে। তবে, এই স্বাধীনতা আইন দ্বারা আরোপিত কিছু বিধিনিষেধের অধীন। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের হাত বাতাসে নাড়ানোর স্বাধীনতা থাকলেও, আইন নির্দেশ করে যে, এই হাত নাড়ানোটা অন্যদের ক্ষতি করবে না। আমাদের কথা বলার অধিকার আছে, কিন্তু আমাদের কথা যেন অন্যদের মর্যাদা বা অনুভূতিতে আঘাত না করে।

মানব জীবনের জন্য এই ধরনের আইন অপরিহার্য, এই বিষয়ে সর্বজনীন ঐক্যমত রয়েছে দুনিয়াজুড়ে। এ কারণেই সকল জাতি ও সমাজেরই আইনি ব্যবস্থা, সংবিধান এবং সেগুলো প্রয়োগের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা যায়: মানবতার জন্য এই আইনগুলি কার তৈরি করা উচিত? ব্যক্তিরা কি নিজের জন্য আইন নিজেরাই তৈরি করবেন? এই প্রশ্নটি যে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ, আমরা প্রতিদিন যে পছন্দগুলি করি তা ভেবে দেখুন- আমরা কীভাবে আমাদের হাত ব্যবহার করি, আমরা কী দেখতে পছন্দ করি, আমরা কী শুনি, আমরা কী বলি এবং আমরা কোথায় যাই। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে কার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত? যদি আমরা বলি যে প্রতিটি ব্যক্তির নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিজেই নেওয়া উচিত, তা হলে সমাজ ক্রমাগত সংঘাতের মধ্যে থাকবে, যেখানে

কোটি কোটি মানুষ কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা অনুসারে কাজ করবে। এমন একটি পৃথিবী থাকবে যেখানে ছয় বিলিয়ন মানুষ তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ও চাহিদার অবাধ অনুসরণ করে - তা অকল্পনীয়!

মালিকানা

এই প্রশ্নের পাশাপাশি আরও একটি মৌলিক সমস্যা দেখা দেয়: আমাদের নিজেদের উপর আসলে কতটা নিয়ন্ত্রণ আছে? আমরা সচরাচর বলে থাকি— 'আমার হাত', 'আমার পা', 'আমার চোখ', 'আমার কান', 'আমার জিহ্বা', 'আমার নাক' ইত্যাদি। তবে, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, আমরা বুঝতে পারব যে, এগুলোর কোনটিই প্রকৃত অর্থে আমাদের নই। আমাদের নিজেদের শরীরের উপর আমাদের সম্পূর্ণ মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ নেই। যদি আমাদের হাত সম্পূর্ণরূপে আমাদের হত, তা হলে তারা কখনও ব্যথা, দুর্বলতা বা পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস) অনুভব করবে না। তবুও, তারা এসব কিছুই করে। এই বাস্তবতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের মালিকানার অনুভূতি সীমিত এবং আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের শক্তির অধীন। যদি আমাদের চোখ সত্যিই আমাদের নিজস্ব হত, তা হলে আমাদের চশমা পরার প্রয়োজনই হত না। যদি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে আমাদের হত, তা হলে সেগুলি ক্ষীণ বা দুর্বল হত না। যদি আমাদের কান সত্যিই আমাদের হত, তা হলে আমাদের শ্রবণশক্তি হ্রাস পেত না। এর অর্থ আমাদের হচ্ছে শরীর ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জীবন, স্বাস্থ্য এবং আমরা 'আমাদের' বলে যা কিছু দাবি করি, তা আসলে চূড়ান্ত অর্থে আমাদের নয়। এগুলি সম্পূর্ণরূপে আমাদের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রিত নয়। যিনি এ সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের দিয়েছেন - মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ শক্তি - তাঁর তাদের উপর চরম মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমরা এর কোনোটাই তৈরি করিনি। বাস্তবে, মানুষ এই পৃথিবীতে কিছুই তৈরি করে না। বোঝার সুবিধার্থে আমরা বলি যে, একজন ছুতোর একটি টেবিল তৈরি করেছিল। কিন্তু ছুতোর টেবিলের জন্য ব্যবহৃত কাঠ তৈরি করেনি, বা পেরেকটি ধরে রাখার জন্য ব্যবহৃত লোহাও সে তৈরি করেনি। তিনি টেবিল তৈরির জন্য ব্যবহৃত ছেনির লোহা বা হাতলের কাঠ তৈরি করেননি। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি ছুতোর নিজেও অন্য

কোনও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হননি। অতএব, এটা বলা ভুল যে ছুতোর আসলে টেবিল 'তৈরি' করেছিলেন। কেউ সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি করতে পারে না; তারা কেবল মহাবিশ্বে ইতিমধ্যে বিরাজমান উপকরণগুলিকেই পুনর্নির্মাণ বা রূপ পরিবর্তন করতে পারে। যেহেতু মানুষ মূল বা আসল সৃষ্টির কাজ করে না, তাই তাদের কোনও কিছুর উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা, কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নেই। সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র মালিক হলেন স্রষ্টা। সুতরাং, একমাত্র তাঁরই আছে চূড়ান্ত আইন প্রণয়ন ক্ষমতা। আমাদের জীবনযাপন কীভাবে করা উচিত এবং আমাদের কী করা উচিত বা কী করা উচিত নয় তা নির্ধারণ করার অধিকার কেবল তাঁরই রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক নীতি: আর নীতিটা হল স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করা। যেসব ক্ষেত্রে মানুষের পছন্দ করার ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা রয়েছে, সেখানে তাদের অবশ্যই তাঁর দ্বারা নির্ধারিত শর্ত মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই ঐশ্বরিক ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করে, তাকে বলা হয় মুসলিম। আর এই ধরণের ব্যক্তিদের একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় মুসলিম । ইসলাম ধর্ম কোনও জাতি, জাতীয়তা, ভাষা, অথবা কোনও সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিচয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত বা নির্ধানিত নয়। ইসলাম হল সেই একই সৃষ্টিকর্তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, নির্ধারিত আইনি ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করা, যিনি মহাবিশ্ব পরিচালনা করার আইন বা বিধান গঠন করেছেন। আর যারা এই জীবনধারা দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করে কেবল তারাই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম।

আমাদের সীমাবদ্ধতা

সৃষ্টিকর্তা হলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা—এর ভেতরে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি। সৃষ্ট প্রাণীরা কখনও স্রষ্টার সমকক্ষ হতে পারে না। ধর্মতত্ত্বে অর্থাৎ ধর্মীয় বিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, স্রষ্টা সৃষ্ট জগতের যেকোনও কিছুর তুলনার বাইরে। মহাবিশ্ব নিজেই স্রষ্টার সৃজনশীল শক্তির একটি নিখুঁত নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন কিভাবে আমরা একটি ঘড়ি বা অন্য কোনও বস্তু তৈরি করি - এটি তার নির্মাতার মতো দেখতে, শুনতে, ভাবতে বা বুঝতে পারে না। তবুও, এটি তার নির্মাতার বুদ্ধিমত্তা ও কারিগরি দক্ষতার প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অনুরূপভাবে,

মহাবিশ্বের কোনও কিছুই স্রষ্টার মতো দেখতে, শুনতে, জানতে, বুঝতে বা কাজ করতে পারে না। সৃষ্টির কোনওটিই স্রষ্টার মতো সর্বশক্তিমান বা সর্বজ্ঞ নয়। যাইহোক, মহাবিশ্বের প্রতিটি উপাদান স্রষ্টার সৃজনশীল প্রতিভা, উৎকর্ষতা তুলে ধরে। অতএব, ধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শুধুমাত্র স্রষ্টা- যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা - মানবজাতির জন্য আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাখেন। পক্ষান্তরে, মানুষকে কেবল তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে এবং তাঁর আনুগত্য সহকারে জীবনযাপন করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল কুরআন বলে—

''হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।" (কুরআন ২ ২১)

সমাজে একটি গভীর বিশ্বাস গেঁথে আছে যে, আমাদের জন্ম তারিখ, রাশিচক্র বা নক্ষত্র জেনে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। আমাদের দেশে, অনেক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে কী ঘটবে তার ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে রাশিফল প্রকাশ করে। ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর সাপ্তাহিক পূর্বাভাস অগ্রিম জেনে যাওয়া কার্যকর বলে মনে হতে পারে, আমাদের অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগ এড়াতে, প্রত্যাশা পূরণ করতে এবং বিজ্ঞতার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করে। কিন্তু সত্য কথা হল জ্যোতিষশাস্ত্রের লক্ষণের উপর ভিত্তি করে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। এই জাতীয় বিশ্বাস ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার জন্ম তারিখ, রাশিচক্র এবং নক্ষত্র সম্পর্কে জানতেন। তিনি নিয়মিত জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এত কিছুর পরেও, তাদের কেউই তাকে অবহিত করেনি যে, তার নিজের দেহরক্ষী তাকে গুলি করে হত্যা করবে। রাজীব গান্ধীর ভাগ্যও আলাদা ছিল না। তামিলনাড়ুতে বোমা বিস্ফোরণের ভবিষ্যদ্বাণী কেউ করেনি। বিস্ফোরণ তার জীবন কেড়ে নিয়েছিল। গুজরাতের হাজার হাজার মানুষ তাদের জন্মের বিবরণ জানত এবং জ্যোতিষীরা তাদের রাশিফল প্রস্তুত করত। তবুও, কেউই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেনি যে, ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে। যদি রাশিফল পড়ে ভবিষ্যৎ সত্যিই বোঝা যেত, তা হলে নিশ্চয়ই এই ধরনের ট্র্যাজেডি প্রতিরোধ করা যেত।

পি.জে.এস.গিয়ানি, পি.কে.চক্রবর্তী, জগজিৎ উৎপল, রামন থাক্কর এবং মালতী সিরসিকরের মতো বিখ্যাত জ্যোতিষীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, তাদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়নি। উৎপল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, নবম লোকসভা নির্বাচনে রাজীব গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে আসবেন, কিন্তু তা ঘটেনি। একজন সুপরিচিত জ্যোতিষী বাজন ভারুওয়ালা উপসাগরীয় যুদ্ধের ঠিক একদিন আগে দাবি করেছিলেন যে, কোনও যুদ্ধ হবে না - যদিও ইতিহাস অন্য কিছু প্রমাণ করে। এই ধরনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, মানুষ ভুল ভবিষ্যদ্বাণী ভুলে যায় এবং যে কয়েকটি সঠিক বলে মনে হয় বা পুনর্ব্যাখ্যা করা যায় সেগুলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। সত্যটি থেকে গেছে যে, কোনও জ্যোতিষী, ভবিষ্যদ্বাণীকারী, অথবা তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণীকারী কখনও ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানির জন্য দায়ী বাংলাদেশী ঘূর্ণিঝড়, অথবা ইরান, লাতুর এবং গুজরাতে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মতো বড় ধরনের দুর্যোগের ভবিষ্যদ্বাণী করেননি।

অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং ভবিষ্যৎ জানার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আশার সাথে ভবিষ্যদ্বাণীকারীদের সন্ধান, জানতে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষিত ব্যক্তি, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, সাংস্কৃতিক আইকন ব্যক্তিবর্গ এবং এমনকি শাসকবর্গ এ ধরনের প্রবণতা থেকে মুক্ত নন। ফলস্বরূপ, তারা কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে অতিপ্রাকৃত জ্ঞানকে আরোপ করে, তাদের ভবিষ্যৎ ভবিষ্যদ্বাণী করার ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে। তবে, বাস্তবতা হল যে, কেউই - মহাবিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর ছাড়া - অজানা সম্পর্কে জানে না। ইসলাম স্পষ্টভাবে এটি বলে দিয়েছে। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের দূরে অবস্থিত ডুমুর গাছের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তারা বুঝতে পারেননি কেন এটি ফল দেয়নি (মথি ২১:১৮)। একইভাবে, যখন তাঁর প্রিয় স্ত্রী আয়েশার বিরুদ্ধে একটি অপবাদমূলক অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল, তখন নবী মুহাম্মদ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেননি যে, অভিযোগটি মিথ্যা। প্রকৃত সত্যটি কেবল পরে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে, ভগবান রাম তাঁর নিজের সন্তান লব এবং কুশকে চিনতে পারেননি যখন তারা তাঁর সামনে এসে রামায়ণ পাঠ করেছিলেন। তাঁর প্রিয় স্ত্রী সীতা যখন লঙ্কায় ছিলেন তখন তিনি অতিপ্রাকৃত উপায়ে তাদের খুঁজে পেতে অক্ষম ছিলেন। এই ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে স্পষ্ট করে দেয় যে, নবী এবং পবিত্র পুরুষদের ঐশ্বরিক জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং যোগ্যতা

স্রষ্টা ছাড়া আর কারওই কার্যকারণ সম্পর্কের বাইরে জ্ঞান নেই। এমনকি স্রষ্টার দূতরাও (নবী) নিজে থেকে ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে না; তারা কেবল সেই জ্ঞানই গ্রহণ করেন যা তাদের কাছে তিনি পৌঁছে দেন। অতএব, সৃষ্টিকর্তা ছাড়া পৃথিবীতে কেউই প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অতিপ্রাকৃত উপায়ে ভাল বা ক্ষতি করতে পারে না। কেবল মহাবিশ্বের স্রষ্টাই লুকানো জিনিস প্রকাশ করার, বিদ্যমান উপকরণগুলিকে রূপান্তরিত করার বা সম্পূর্ণ নতুন কিছু তৈরি করার ক্ষমতা রাখেন। যা নেই তা থেকে কিছুই তৈরি করা যায় না। সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ অতিপ্রাকৃত জিনিস জানতে বা ভবিষ্যৎ দেখতে পারে না। সুতরাং, দেবত্ব বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার দাবি হল মিথ্যা। যারা এই ধরনের শক্তিতে বিশ্বাস করে - তাদের নাম বা পটভূমি যাইহোক না কেন - তারা বিশুদ্ধ কুসংস্কারে লিপ্ত আছে। স্রষ্টার ইনক্লুসিভ গুণাবলী অন্য কোন সত্তার সাথে জুড়ে দেওয়াটাই হল শিরক (স্রষ্টার সাথে অংশীদার স্থাপন)। আর এটি একটি চিরন্তন পাপ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, স্রষ্টা ছাড়া আর কারওরই ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা (সিদ্ধি) নেই। অতিপ্রাকৃত উপায়ে মাথাব্যথা, পেটব্যথা বা মানসিক অসুস্থতার মতো রোগ সৃষ্টি করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এই ধরনের কোনও শক্তি বিদ্যমান থাকত, তা হলে যুদ্ধ এবং হত্যা অপ্রয়োজনীয় মনে হত। কেননা শত্রুদের কেবল রহস্যময় শক্তির মাধ্যমে নির্মূল করা যেত। যে কোনও দেবতা, আত্মা বা সত্তা এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে তা হচ্ছে মিথ্যা। যারা সিদ্ধের পোশাক পরে এবং আউলিয়া হয়ে রাজত্ব করে, তাদের যদি সত্যিকারের শক্তি থাকে, তা হলে তারা ফিলিস্তিনিদের উপর নির্মম নির্যাতনকারী ইসরায়েলি শাসককে অবিরাম মাথাব্যথা এবং পেটব্যথা দিয়ে কষ্ট দিক। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, তারা তা করতে পারে না। যারা ঐশ্বরিক সিদ্ধি এবং অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দাবি করে, তারা নিজেদেরও বাঁচাতে পারে না।

কার উপাসনা করব?

অতএব, স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারও নিকট প্রার্থনা করবে না বা সাহায্য চাইবে না। কেবল তাঁরই নিকট চাইবে যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক - যিনি একমাত্র ঐশ্বরিকভাবে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। মানত এবং উপাসনার আচার-অনুষ্ঠান কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা উচিত। ধর্ম মানবতাকে কেবলমাত্র স্রষ্টার আনুগত্য ও উপাসনা করতে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেয়।

বাইবেলে বলা হয়েছে: ''আবার, শয়তান তাকে খুব উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং তাকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য এবং তাদের জাঁকজমক দেখাল। সে বলল, 'যদি তুমি মাথা নত করে আমার উপাসনা করো, তা হলে আমি তোমাকে এই সব দেব।' যীশু তাকে বললেন, 'আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান!' কারণ লেখা আছে: 'তোমার প্রভুর উপাসনা করো, এবং কেবল তাঁরই সেবা করো।' 'তখন শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল, এবং স্বর্গদূতরা এসে তার সেবা করলেন।" (মথি ৪:৮-১১, লূক ৪ ৫-৮)

একটি বিখ্যাত হিন্দু স্তোত্র ঘোষণা করে এভাবে

'ত্বামেকম শরণ্যম ত্বামেকম ভারেন্যম
ত্বামেকম জগত কারান্নাম বিশ্বরূপা'

(আমরা শুধু তোমারই উপাসনা করি। একমাত্র তোমারই নিকট আশ্রয় নিই। একমাত্র তুমিই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। তুমিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ।)

একইভাবে, কুরআন আদেশ করে:

''হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, আত্মসমর্পণ করো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুক্তি পেতে পারো।" (কুরআন ২:২১)

''আমরা কেবলমাত্র তোমারই ইবাদত করি, এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" (কুরআন ১:৫)

ন্যায়বিচার

ইসলামের দ্বিতীয় ভিত্তি হল পরকালের উপর বিশ্বাস। আমরা সকলেই জানি, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু কেউই এই পার্থিব জীবনে তাদের কৃতকর্মের পরিণাম পুরোপুরি ভোগ করার পর মৃত্যু বরণ করে না। ইতিহাস জুড়ে দেখা যায়, দুনিয়া জুড়ে অনেক খুনি ও নির্মম অত্যাচারী ছিলেন যারা অসংখ্য মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছেন। তথাপি, মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা প্রায়শই দেখা যায় যে, তাদের অপরাধীদের প্রকৃত প্রাপ্য শাস্তি দিতে পারে না। মানবীয় বিচার ব্যবস্থা, সমাজ সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারে। কিন্তু এটি কি সত্যিই ন্যায়বিচার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যদি আমাকে হত্যা করা হই, তা হলে আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। যাইহোক, আমার হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলেও তাদের যন্ত্রণা লাঘব হবে না। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উল্টে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিশোধের একটি রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু এটি ঘটে যাওয়া ক্ষতির প্রতিকার করে না। তবুও, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রচলিত আইনের আদালত এবং আইনি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনিয়তা রয়েছে।

কেউই অন্যায় চায় না। প্রতিটি ব্যক্তিই সুবিচারের জন্য আকুল, প্রত্যাশা করে। আমি আপনাদের এমন একটি অভিজ্ঞতার শেয়ার করতে চাই যা আমি সব সময়ই মনে রাখব। কোঝিকোড় (কালিকট) জেলার একটি পুলিশ স্টেশনে সোমান নামে একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে খুন করা হয়েছিল। গভীরভাবে সন্দেহ করা হয়েছিল যে, তার মৃত্যুর জন্য তার সহকর্মীরাই দায়ী। বিচারিক প্রক্রিয়ায় নিম্ন আদালতে তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তবে, আট বছর পর, হাইকোর্ট তাদের সকল অভিযোগ থেকে খালাস দেয়। রায় শোনার পর, সোমান-এর স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন। একটি হৃদয়বিদারক মুহূর্ত ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছিল এবং প্রধান মালায়ালাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই ঘটনাটি সুবিচারের জন্য মানবতার গভীর প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করে। পরিশেষে, এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার খুব কমই পাওয়া যায়। যারা শত শত, হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ মানুষের

জীবন কেড়ে নিয়ে ব্যাপকভাবে নৃশংসতা করে, তারা প্রায়শই শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। একইভাবে, যারা সৎকর্ম এবং পুণ্যের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করে, তারা তাদের প্রাপ্য পুরস্কার নাও পেতে পারে এই দুনিয়ায়। এই বাস্তবতা পরকালের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে, যেখানে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রদান করা হবে। অন্যায়কারী এবং ধার্মিক উভয়ই তাদের প্রাপ্য শাস্তি বা পুরস্কার পাবে যথাযথভাবে। আমাদের এটাও স্বরণ রাখতে হবে যে, এটি একটি মহৎ সৃষ্টির চূড়ান্ত পরিণতি।

এক মুহূর্তের জন্য মানবদেহের গঠন নিয়ে চিন্তা করে দেখুন। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, সেখানে ছয় বিলিয়নেরও বেশি মানুষ রয়েছে। একই বাতাসে শ্বাস নেওয়া, একই জল পান করা এবং একই পৃথিবীতে একই সূর্যের নীচে বসবাস করা সত্ত্বেও, কোনও দুটি ব্যক্তির মুখ দেখতে একই রকম হয় না। মানুষের মুখ একটি ছোট জায়গা যা দুটি হাত দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, তবুও পৃথিবীতে অন্য কেউ আমাদের মতো দেখতে হয় না। হজের সময়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক জায়গায় সমবেত হয়। এত বিশাল ভিড়ের মধ্যেও আমরা সহজেই আমাদের দেশবাসীদের চিনতে পারি। ঠিক একইভাবে, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শবরীমালায় জড়ো হয়, তখন আমরা আমাদের দেশবাসীদের সহজেই চিনতে পারি। এর কারণ হল অন্য কেউ তাদের মতো বা আমাদের মতো দেখতে হয় না। এবারে, আপনার আঙ্গুলগুলি, বিশেষ করে আপনার বৃদ্ধাঙ্গুলি লক্ষ্য করে দেখুন। আঙ্গুলের জায়গাটা কতটা ছোট? কল্পনা করুন যে, একজন দক্ষ শিল্পী কতটা দক্ষতার সঙ্গে এ ধরনের একটি ক্ষুদ্র জায়গার মধ্যে তৈরি করেছেন। তবুও কোটি কোটি মানুষ যারা বেঁচে আছে এবং বেঁচে থাকবে, তাদের মধ্যে দুটি আঙুলের ছাপ এক নই। এই অনন্যতার কারণেই সরকারী নথিতে পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে আঙুলের ছাপ লিপিবদ্ধ করা হয়। চৌদ্দশ বছর আগে, বিশ্বজগতের প্রভু ঘোষণা করেছিলেন: ''আমরাই সেই সত্তা যারা একজন মানুষের আঙুলের ডগা নিখুঁত করতে পারি।'' (কুরআন ৭৫:৪)

এর অর্থ হল, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হওয়ার কয়েক শতাব্দী পূর্বে কুরআন আঙুলের ছাপ সম্পর্কে এই জটিল ধারণাটি প্রকাশ করেছিল। আমাদের প্রত্যেকের মাথায় হাজার হাজার চুল আছে, তবুও আমাদের চুলও দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের চুলে থেকে আলাদা। অনুরূপভাবে, আমাদের শিরা শিরায় দিয়ে হাজার হাজার রক্তের ফোঁটা

প্রবাহিত হচ্ছে, তবুও প্রতিটি ব্যক্তির রক্তকণিকা আলাদা আলাদা থাকে, ঠিক যেমন আঙুলের ছাপে স্বতন্ত্রতা থাকে।

আমাদের প্রত্যেকেরই শরীরের গন্ধ আলাদা, যা অন্যদের থেকে আলাদা। এই কারণেই, পুলিশ কুকুরদের অপরাধীদের ধরার জন্য মানুষের গন্ধ ট্র্যাক করার প্রশিক্ষণ দেয়। এই ধরণের জটিল বিবরণ স্পষ্টতই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতা এবং যত্নশীল নকশার প্রতিফলন উন্মোচিত করে। এত নিখুঁত দক্ষতায় তৈরি একটি প্রাণীর অন্যায্য বা অর্থহীন পরিণতি হবে তা কল্পনাতীত। অতএব, মানুষের অস্তিত্বের একটি ন্যায্য পরিণতি অবশ্যই থাকতে হবে।

মৃত্যুর পর

মানুষকে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এটা ন্যায়বিচারের দাবি। তবে, পৃথিবীতে এই ধরনের চূড়ান্ত ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে পারে না। সুতরাং, ইসলাম যেমন শিক্ষা দেয়, মৃত্যুই শেষ নয়; বরং এটি একটি অবস্থার পরিবর্তন। মানুষের জীবন মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পরকালে তাদের কাজের ফলাফল দেখতে পাবে। কুরআন বলে ''প্রত্যেক প্রাণী তার উপার্জনের জন্য দায়ী।'' (কুরআন ৭৪:৩৮) ''যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করে সে তার প্রতিদান দেখতে পাবে, এবং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে সে তার প্রতিদানও দেখতে পাবে।'' (সূরা আল কুরআন, ৯৯ ৭-৮) অতএব, যদি কেউ স্রষ্টা নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে, তা হলে সে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জান্নাত পাবে। কিন্তু যদি কেউ তাঁর নিষেধকৃত পথ বেছে নেয়, তবে তারা স্রষ্টার ঘোষিত শাস্তির মুখোমুখি হবে।

যদি পরকাল না থাকত, তা হলে এর অর্থ হত যে, সৃষ্টিকর্তা - অথবা, যদি কাউকে প্রকৃতির সৃষ্টির জন্য ধরে নেওয়া হয়- তা হলে তিনি প্রচণ্ড অবিচারকে দুনিয়ায় বিরাজমান রাখতে দিয়েছেন। মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি, অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন: কেউ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, কেউ অন্ধ; কেউ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, কেউ অক্ষম; কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল; কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র; কেউ প্রতিভাবান, আবার কেউ

বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। পরকাল ছাড়া, অন্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ এবং দুর্বলদের দ্বারা ভোগ করা দুঃখকষ্ট এবং বৈষম্য অমীমাংসিত থেকে যাবে। অবিচারের শেষ কোথায়? যদি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়, তা হলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির সমানভাবে জীবন উপভোগ করার এবং উপভোগ করার সুযোগ থাকা উচিত নয় কি? তবুও, এটা অস্বীকার করা যায় না যে, এটি এমন নয়। অতএব, স্রষ্টা - যিনি পুরোপুরি ন্যায়পরায়ণ, তিনি মৃত্যুর সাথে সাথে মানবজীবন শেষ করেন না। এই পার্থিব জীবন পরীক্ষা এবং কর্মের একটি সময়কাল মাত্র। আমাদের কৃতকর্মের বিচার এবং পরিণতি মৃত্যুর পরের জীবনে আসে। প্রতিটি ব্যক্তি তাদের প্রদত্ত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কর্তব্য পালনের জন্য দায়ী হবেন। একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একজন ধনী ব্যক্তির মতো একই রকম জবাবদিহি করতে হয় না। একজন সাধারণ ব্যক্তিকে একজন পণ্ডিতের মতো বিচার করা হয় না। একজন প্রতিভাবান ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশা সাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তির মতো নয়, এবং একজন নিস্তেজ মনের ব্যক্তির জন্যও একই রকম হয় না। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সক্ষম ব্যক্তির তুলনায় অনেকটা কম। জীবনে সাফল্য ব্যক্তিকে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী কর্তব্য পালনের মধ্যে নিহিত। প্রতিটি ব্যক্তি তার ক্ষমতা কতটা কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে তা বিচার করা হবে। সুতরাং, পরকালে পুরষ্কার বা শাস্তি নির্ধারিত হবে ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কতটা ভালোভাবে পালন করেছে তার উপর। সুতরাং, যদি মৃত্যুর পরের জীবন না থাকত, তা হলে এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থার বৈষম্য প্রকৃতপক্ষে অন্যায্য হত। কিন্তু যেহেতু অনন্ত পরকাল হল একটি অতি বাস্তবতা, সম্পদ, স্বাস্থ্য ও মানসিক সক্ষমতাই বিরাজমান পার্থক্য সৃষ্টিকর্তার ন্যায়ের বিরুদ্ধ নয়।

যখনই কেউ কোনও কিছু স্পর্শ করে, তখন তার উপরে আঙুলের ছাপ থেকে যায়। দেহ তার উপস্থিতির প্রমাণ বা স্বাক্ষ্য হিসেবে বাতাসে এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। অনুরূপভাবে, উচ্চারিত কথাগুলি অস্তিত্বে মুদ্রিত হয়ে থাকে। এইভাবে, সমস্ত মানুষের কার্যকলাপ - তা দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য -যথাযথতা ও নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। প্রতিটি কাজ নিজেই পরকালে একজন ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, একজন

ব্যক্তির উচ্চারিত একটি শব্দও অলিখিত থাকে না। মৃত্যুর পর, ব্যক্তিদের তাদের কর্মের উপর ভিত্তি করে স্বর্গের পুরষ্কার দেওয়া হবে অথবা নরকের শাস্তি দেওয়া হবে।

মানুষ কীভাবে আল্লাহ, স্বর্গ, নরক, ফেরেশতা এবং শয়তানের মতো অজৈব (ঐশ্বরিক) বাস্তবতা বুঝতে পারবে? পদার্থবিদ্যার প্রতিটি শাখার নিজস্ব মানদণ্ড বা একক রয়েছে। দুই যোগ দুই সমান চার এবং চারকে চার দিয়ে গুণ করলে ষোল হয়- এই মৌল নীতিগুলি না মেনে কেউ পাটিগণিত শিখতে পারে না। একটি বৃত্তের ৩৬০ ডিগ্রি এবং একটি ত্রিভুজের ১৮০ ডিগ্রি রয়েছে। এই নীতিগুলি মেনে না চললে জ্যামিতি অধ্যয়ন করা যাবে না। ঠিক একইভাবে, জ্যামিতির মানদণ্ড ব্যবহার করে ভূতত্ত্ব অধ্যয়ন করা যায় না, ঠিক যেমন ভূতত্ত্বের নীতির মাধ্যমে শারীরবিদ্যা বোঝা যায় না। অনুরূপভাবে, জ্যোতির্বিদ্যাও শারীরবিদ্যার মানদণ্ড ব্যবহার করে অধ্যয়ন করা যায় না। প্রতিটি শাখার নিজস্ব অনন্য পদ্ধতির প্রয়োজন হয়।

কিন্তু এমন কোন উপায় আছে কি যার মাধ্যমে মানুষ ঐশ্বরিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে - স্রষ্টা, স্বর্গ, নরক, পরকাল, ফেরেশতা এবং শয়তান সম্পর্কে জ্ঞান? এটা একটা সত্য যে , আমরা এখানে আছি এবং এখনই বিদ্যমান, তবুও এটি এমন কিছু নয় যা একজন বিজ্ঞানী টেস্ট টিউব বা পরীক্ষাগার পরীক্ষায় প্রমাণ করতে পারেন, কারণ এই ধরনের জ্ঞান অভিজ্ঞতাগত বিজ্ঞানের মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। একইভাবে, যখন ঐশ্বরিক জ্ঞানের কথা বলা হয়, তখন মানবজাতির একটিই মানদন্ড আছে। আর সেটি হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশ। এই জ্ঞান স্রষ্টার বিশেষভাবে মনোনীত বার্তাবাহকদের (দূত) মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়, যারা সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা। ঐশী জ্ঞান হল নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র মাধ্যম। আর এটি জ্ঞানের ষষ্ঠ উৎস। আমরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে থাকি এবং এর বাইরেও, স্বপ্ন উপলব্ধির আরেকটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যাইহোক, স্বপ্ন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। বিপরীতে, ঈশ্বরের বার্তাবাহকদের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান - ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অন্যান্য ঐশ্বরিক উপায়ের মাধ্যমে - একেবারেই ভুল নয় কারণ এটি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ থেকে উদ্ভূত। এটি আরও ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি: যদি জন্মান্ধ একজন মানুষকে বলা হয় যে, পাতা সবুজ, দুধ সাদা এবং কাক কালো,

তবে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটি যাচাই করার তার কোনও উপায় নেই। তার একমাত্র বিকল্প পথ হল এই তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা। যদি সে নিজে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে, তবে সে জ্ঞানের সম্পূর্ণ জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। একই কথা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঈশ্বরের বার্তাবাহকদের দ্বারা আনা ঐশ্বরিক বার্তা প্রত্যাখ্যান করে - যারা মানবজাতির মধ্য থেকে নির্বাচিত এবং তাদের জীবনে কখনও কাউকে মিথ্যা বলেনি বা ক্ষতি করেনি, তাদের মহৎ চরিত্র, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনযাত্রার দ্বারা আলাদা। যারা বিশেষ বার্তাবাহকদের দ্বারা প্রদত্ত ঐশ্বরিক বার্তা প্রত্যাখ্যান করে তারা নির্ভুল জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকে। ইতিহাস জুড়ে, স্রষ্টা বিশ্বের সকল অঞ্চলে শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানসহ জ্ঞান প্রদানের জন্য রাসূলদের (বার্তাবাহক) নিযুক্ত করেছেন। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন যুগ এবং এলাকায় মানব সমাজকে পথ দেখানোর জন্য এক লক্ষেরও বেশি নবী (দূত) প্রেরণ করা হয়েছে। এই সকল নবী (দূত) মানবতার কাছে একই মৌলিক বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন: ''নত হও, একমাত্র তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করো, কেবল তাঁরই উপাসনা করো এবং আনুগত্য করো - এই মহাবিশ্বের পিছনের সর্বোচ্চ শক্তি। যারা অহংকারী এবং অবৈধভাবে তাঁর কর্তৃত্ব দখল করার চেষ্টা করে তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করো।''

ইতিহাস জুড়ে দেখা যায়, ভারত, আফ্রিকা, আমেরিকা ও আরব বিশ্বে, ঐশ্বরিক বার্তাবাহক (দূত) নিযুক্ত করা হয়েছে। এই পবিত্র বার্তাবাহক শৃঙ্খলের চূড়ান্ত যোগসূত্র হলেন নবী মুহাম্মাদ। আর তিনিই হলেন শেষ নবী (দূত)। চৌদ্দ শতাব্দীরও বেশি আগে আরব মরুভূমিতে তাঁকে ঐশ্বরিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি 'আল আমীন' (সত্যের সন্ধানকারী) উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। ইসলামের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সহ স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিশ্বাস ইসলামের তৃতীয় মৌলিক নীতি হিসেবে বিবেচিত।

তিনটি সম্পর্ক

ইসলাম তিনটি মৌলিক সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে: মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্ক, মানুষ ও সহ-মানুষের মধ্যে সম্পর্ক, এবং মানুষ ও মহাবিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মানুষ এবং স্রষ্টার মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এবং এই আচরণ মানব আত্মাকে স্বর্গীয় নৈকট্য অর্জনের সুযোগ করে দেয়। অন্য কথায় বলা যায়, স্রষ্টা মানবজাতির উপর সীমাহীন আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন, অবর্ণনীয় আরাম প্রদান করেছেন। উপাসনা হল এই আশীর্বাদগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। ইসলাম চারটি অপরিহার্য ইবাদতের (উপাসনা) নির্দেশ দিয়েছে। প্রথম এবং প্রধান কাজ হল নামাজ বা প্রার্থনা, যা মানুষকে সৃষ্টিকর্তার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম। নামাজ হল সৃষ্টিকর্তার সাথে একজন বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত সংলাপ। আত্মার আধ্যাত্মিক যাত্রা তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতিতে।

যখন বিশ্বাসীরা প্রার্থনা করে - যা আপনি প্রায়শই দেখতে পাবেন - তখন তারা একটি সোজা লাইনে দাঁড়ায়। তার পূর্বে, তারা অযু করে - যা এক ধরনের ধর্মীয় পবিত্রতার মাধ্যম। তবে, এই পবিত্রতা শুধু শরীরের বিভিন্ন অংশ ধোয়ার বিষয়ে নয়; এটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পবিত্রতার একটি প্রতীকী স্বীকৃতি। এই অযু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মুসলমানরা পবিত্র অবস্থায় নামাজে প্রবেশ করে। সেই মুহূর্তে, তারা কেবল মেঝেতে দাঁড়িয়ে থাকে না; বরং, তারা পার্থিব অস্তিত্ব অতিক্রম করে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতিতে দাঁড়ায়। প্রতিটি বিশ্বাসীর এই গভীর সচেতনতা উপলব্ধি করা উচিত। নামাজ চলাকালীন, একজন নামাজী ক্ষণিকের জন্য তারা তাদের ঘর, দেশ, পেশা, ব্যবসা, চাকরি-বাকরি, পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানায় অর্থাৎ ভুলে থাকে। এইভাবে, তারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জন করে, পূর্ণরূপে স্রষ্টামুখী হয়ে উঠে। এই স্বর্গীয় সংযোগের পাশাপাশি, প্রার্থনার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে দুটি অপরিহার্য গুণাবলী ধারণ করতে হবেই। প্রথমটি হল সামাজিক চেতনা। এমনকি যখন একজন ব্যক্তি একাকী প্রার্থনায় থাকে, তখনও তাকে বলতে হবে, 'আমরা কেবল তোমারই উপাসনা করি।' যদি কেউ বলে, 'হে মনিব! আমি

কেবল তোমারই উপাসনা করি,' তবে তার প্রার্থনা কবুল হবে না। 'আমরা' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ - এটি বিশ্বজুড়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সকল নিবেদিতপ্রাণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্রার্থনা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে, বিশ্বাসী প্রার্থনা করে, 'আপনার সমস্ত বিশ্বস্ত বান্দাদের মুক্তি এবং কল্যাণ দান করুন।' প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দিনে পাঁচবার এই নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক। এর অর্থ কী? এটা মানবজাতির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল এবং প্রজন্মর সকল আন্তরিক উপাসকদের জন্য একটি সর্বজনীন প্রার্থনা। সুতরাং, নামাজ একটি পবিত্র কাজ যা বিশ্বাসীকে সময়, ভূগোল, জাতি এবং বর্ণের ঊর্ধ্বে, বিশ্ব নাগরিকে পরিণত করে। এই ধরনের উপাসনা একজন বিশ্বাসীর চরিত্রকে একটি সংকীর্ণ স্তর থেকে সামাজিকতার সীমাহীন সাম্রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেয়।

অনুরূপভাবে, মুসলমানরা একই নেতার অধীনে একই দিকে মুখ করে নামাজ আদায়ের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। এই সারিবদ্ধ অনুশীলন তাদের মধ্যে সমতার গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কল্পনা করুন এমন একটি দৃশ্য যেখানে একজন সিপাহী প্রথমে মসজিদে আসেন এবং তার পরে একজন কালেক্টর আসেন। এই ক্ষেত্রে, কালেক্টরকে তার মাথা সিপাহীর পায়ের কাছে রাখতে হবে। যদি একজন পিয়ন আগে আসে এবং একজন মন্ত্রী পরে আসে, তা হলে মন্ত্রীকে তার মাথা পিয়নের পায়ের কাছে রাখতে হবে। যদি কেউ বলে, 'তিনি আমার অফিসে কেবল একজন সিপাহী; আমি তার পায়ের কাছে আমার মাথা রাখব না,' তা হলে তার নামাজ গণ্য হবে না। কেউ রাজা, সম্রাট বা শাসক যাই হোন না কেন, তাদের অবশ্যই তাদের আগে যারা এসেছিলেন তাদের সামনে মাথা নত করতে হবে। এই অনুশীলন যে সাম্য এবং নম্রতার অনুভূতি ব্যক্তির মাঝে জাগিয়ে তোলে তা সত্যিই অতুলনীয়।

ইসলামের ইবাদতের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল রোজা। মুসলমানরা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো এক মাস ধরে রোজা রাখে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য পানাহার থেকে বিরত থাকে। এই ইবাদতের অভ্যাস ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলা গড়ে তোলে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে।

যারা কোনও বাধা ছাড়াই যা মনে হয় তাই খায়, পান করে, দেখে বা কথা বলে, তারা হল পশুর মতো। ইন্দ্রিয়গত আকাঙ্ক্ষার অবাধ অনুসরণ পশুত্বের রাজ্যের

অন্তর্গত বিষয়; এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেই একজনকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে। রোজা হল ইচ্ছা-চাহিদা দমন করার, ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করার এবং আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি শক্তিশালী উপায়। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করে, একজন ব্যক্তি আত্মসংযম অনুশীলন করে। অর এটি হল একজনের ভক্তি মজবুত করার একটি গভীর উপায়। এ ছাড়া, রোজা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি একজন রোজাদার মুমিন খারাপ আচরণে লিপ্ত হয় বা কঠোর কথা বলে, তা হলে তার রোজার আসল মর্মার্থ নষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন: ''যদি কেউ মিথ্যা কথা এবং প্রতারণামূলক কাজ পরিত্যাগ না করে, তা হলে তার খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর কোনও প্রয়োজন নেই।"

যদি মানুষের সাথে কারও সম্পর্ক খারাপ হয়, তা হলে স্রষ্টার উপাসনাও নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ ছাড়া, রোজা যে সাম্যের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তা অসাধারণ। বিশ্বজুড়ে বিশ্বাসীরা নির্দিষ্ট সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব করে, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য থেকে বিরত থাকে। এই বিধানে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনও বৈষম্য নেই।

যাকাতের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য। যেমন রোজা মানে এই যে, দেহ কারও নিজস্ব নয় বরং তা স্রষ্টার এবং তাঁর আদেশ অনুসারে ব্যবহার করতে হবে। অনুরূপভাবে, যাকাত হল এমন একটি ইবাদত যা এই সত্য প্রকাশ করে যে সম্পদও স্রষ্টার। তিনি যেমন চান তেমনই ব্যবহার করতে হবে। বিশ্বাসীদের তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ দান করতে হয়, যা স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করার একটি কাজ। আর এটি হচ্ছে একটি চমৎকার ইবাদত। কিন্তু কারা এসবের দ্বারা উপকৃত হয়? অর্থ বান্ডিল করে সরাসরি স্রষ্টার কাছে পাঠানো অসম্ভব। তার পরিবর্তে, সেই সম্পদ অবশ্যই দুঃখী, দরিদ্র, অসহায়, অভাবী এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য দান করতে হবে। এর অর্থ হল সৃষ্টিকর্তার এই উপাসনার প্রকৃত প্রাপকরা হলেন সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যরা।

ইসলামে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থযাত্রা হল হজ্জ। এই উপাসনা ব্যক্তিদের স্রষ্টার নিকটবর্তী করে তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি একটি গভীর ইবাদত। তবে, এই ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য, সহযাত্রীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। এটি কেবল দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য নয়; এমনকি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে অন্য

ব্যক্তির সঙ্গে শুয়ে থাকাকেও নিরুৎসাহিত করা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে: ''যে কেউ হজ্জ পালনের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সে যেন হজ্জের সময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অশ্লীল ভাষা এবং তর্ক থেকে দূরে থাকে।'' (কুরআন ২: ১৯৭)

এখানে ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, কোনও ভক্ত, উপাসক অন্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখে না, তার উপাসনা অর্থহীন। একইভাবে, হজযাত্রীদের মধ্যে যে সাম্যের অনুভূতি গড়ে উঠে তা অসাধারণ। বিভিন্ন ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পটভূমির মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়, তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় পরিহার করে একই পোশাক পরিধান করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই ধরেন প্রার্থনা করে। তাদের লক্ষ্য হল স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা; ভাষা এক; জপ অর্থাৎ আরাধনা এক; আচার এক; উপাসনা এক। জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা এবং উপভাষার বাইরে মানবতা এখানে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সাম্যের কী গভীর ও সুন্দর প্রকাশ!

ম্যালকম এক্স, কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের একজন ঐতিহাসিক প্রতিনিধি - নির্যাতিত, বঞ্চিত এবং ঘৃণ্য নির্যাতনের শিকার - ছিলেন একজন আমেরিকান নাগরিক। তিনি প্রকৃত মুক্তির সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিলেন। তিনি অবশেষে ইসলামে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তিনি তার হজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছিলেন এভাবে:

'বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। নীল চোখের, সোনালী চুলের মানুষ থেকে শুরু করে কালো চামড়ার আফ্রিকান, সকল বর্ণের মানুষ একসাথে দাঁড়িয়েছিল। এত কিছুর ভেদাভেদ থাকার পরও, আমরা সকলেই একই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি। এই আচার-অনুষ্ঠানগুলি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চেতনার অকাট্য দলিল ছিল। আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এই ধরনের ঐক্য কখনও থাকতে পারে না। আমেরিকার ইসলামকে বোঝা দরকার কারণ ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সমাজে বর্ণগত শ্রেণি-বিভাজন সম্পূর্ণরূপে দূর করতে সক্ষম। মুসলিম বিশ্বে আমার ভ্রমণের সময়, আমি এমন লোকদের সাথে দেখা করেছি, কথা বলেছি এবং এমনকি খাবার খেয়েছি যারা আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু ইসলাম তাদের মন থেকে 'শ্বেতাঙ্গতা' ধারণাটি মুছে ফেলেছে। এর আগে আমি কখনও সকল বর্ণের মানুষকে একত্রিত হতে এবং

তাদের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে দেখিনি।' (ম্যালকম এক্স, পৃ. ৪৩৮)

হজ্জ তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্মরণীয় জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত: নবী ইব্রাহিম, তাঁর পুত্র নবী ইসমাঈল এবং তাঁর স্ত্রী হাজেরা। যদি আমরা সামাজিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করি, তা হলে নবী ইব্রাহিম আমেলু গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাই তিনি একজন সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর বলে বিবেচিত ছিলেন। যাইহোক, লক্ষ্য করুন - সমসাময়িক মানব সমাজের বস্তুবাদী মানদণ্ড অনুসারে, হাজেরা চারটি অনুভূত 'ঘাটতি'র প্রতীক। প্রথমত, তিনি একজন ছিলেন দাসী। দাসীরা সর্বদা সর্বত্র অবহেলিত - যারা হাসতে বা কাঁদতেও স্বাধীন নয়। তাদের নিজস্ব অস্তিত্বের কোনও স্বায়ত্তশাসন বা স্বীকৃতি নেই। তারা তাদের প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নত হতে বাধ্য, কেবল তাদের প্রভুর আঙুল বা ঠোঁটের সামান্যতম নড়াচড়ায় সাড়া দিয়ে থাকে। তিনি ছিলেন সমাজের তথাকথিত অ্যান্টি-ট্রেজারের অংশ, চিরকাল অতুলনীয় যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য নিন্দিত।

দ্বিতীয়ত, হাজেরা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ। এমনকি আধুনিক তথাকথিত সভ্য সমাজেও, কৃষ্ণাঙ্গরা বৈষম্য ও প্রান্তিকতার মুখোমুখি হচ্ছে। হাজেরা তাদের প্রতিনিধিত্ব করতেন যারা সকলের দ্বারা অবহেলিত, লাঞ্ছিত। তৃতীয়ত, হাজেরা ছিলেন একজন বিদেশীনী। বিদেশীদের সংগ্রাম আজ সুপরিচিত, এমনকি আজকের আন্তঃসংযোগ দুনিয়ায়ও যা বিশ্ব গ্রাম বলে আখ্যায়িত। চতুর্থত, হাজেরা ছিলেন একজন নারী। সাধারণত প্রায় সর্বত্রই একটি মেয়ে নির্যাতনের শিকার হয়। নারী হাজেরা, সামাজিক মানদণ্ড অনুসারে, এই চারটি তথাকথিত ত্রুটি ধারণ করে, দুটি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়েছিলেন - উপাসনা করার জন্য নয়, আচার-অনুষ্ঠান করার জন্য নয়, প্রার্থনা বা অনুষ্ঠানের জন্য নয়, বরং আরও মৌলিক কিছুর জন্য। তিনি তার শিশু সন্তানের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সন্ধানে সেই পাহাড়গুলিতে আরোহণ করেছিলেন। তার পদচিহ্নের কারণেই এই পাহাড়গুলি পবিত্র হয়ে উঠে। কুরআন ঘোষণা করে—

''প্রকৃতপক্ষে, সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম একটি।" (কুরআন ২: ১৫৮)

হাজেরার পদচিহ্নের কারণে, এই পর্বতমালা হজ্জ তীর্থযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে, যা শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ ধরে প্রজন্মের দ্বারা সম্মানিত। প্রতিটি তীর্থযাত্রী (হাজী) - তা সে একজন রাজপুত্র, শাসক, রাজা বা সম্রাট হোক না কেন - চার হাজার বছর আগে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, দাসী, বিদেশী মহিলা যে পথে হেঁটেছিলেন, তাকে সেই একই পথে অবশ্যই চলতে হবে। এই ধর্মীয় অনুশীলন নম্রতা ও সাম্যের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। এটি মানবতাকে নির্যাতিতদের মর্যাদার কথা মনে করিয়ে দেয়। এই চেতনা বিশ্বাসীদের তাদের স্রষ্টার কাছাকাছি নিয়ে আসে। উপাসনার মাধ্যমে, সামাজিক সচেতনতা জাগ্রত হয় এবং সাম্যের প্রকৃত অর্থ আরও দৃঢ় হয়। এটি পৃথিবীর প্রভুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আত্মাকে স্রষ্টার সান্নিধ্যে সহায়ক তীর্থযাত্রায় (হজ্জ) শরিক হওয়ার বিরল সুযোগ এনে দেয়। এর পাশাপাশি, এটি মানুষের মধ্যে গভীর নম্রতা জাগ্রত করে তোলে। সর্বোচ্চ উপাসনা, নামাজের সময়, সর্বাধিক উচ্চারিত বাক্যাংশটি হল 'আল্লাহু আকবার'। অনেকেই জ্ঞানের অভাবের কারণে এর অর্থ ভুল বোঝে থাকে। বাস্তবে, এর অর্থ 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ' অথবা এর নির্যাস হচ্ছে আমি ছোট ও তুচ্ছ। স্রষ্টা ও তাঁর ঐশ্বরিক বিচারের সামনে আমার আগ্রহ ও চাহিদা নিতান্তই নগণ্য। একজন বিশ্বাসী দিনে পাঁচবার নামাজে এই বাক্যাংশটি বার বার বলে। আর এই পুনরাবৃত্তি এই বোধগম্যতাকে আরও দৃঢ় করে যে, মহাবিশ্ব এবং এর মধ্যে থাকা সবকিছু সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের তুলনায় অতি নগণ্য।

বিশ্বের সকল সমস্যার মূল শিকড় হচ্ছে ইগো বা আত্ম অহংকার!

'আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ; আমিই সিদ্ধান্ত নেব'—সকল অন্যায়ের মূলে রয়েছে, যা প্রথম ভুল থেকেই শুরু হয়। এই অহংকার, দাম্ভিকতা প্রতিহত করার জন্য, একজন বিশ্বাসী নামাজের সময় দিনে কমপক্ষে ৯৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে ডাকে। এই পুনরাবৃত্তি নম্রতা এবং স্রষ্টার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার আর্জি হিসেবে কাজ করে।

ধর্মের মানবতা

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন: যদি একজন ব্যক্তির অন্যদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তা হলে সমস্ত ইবাদত (আরাধনা) তার মূল্য হারায়,

অর্থহীন হয়ে পড়ে। নবী মুহাম্মাদ (সা:) একবার তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমরা কি জানো কারা নিঃস্ব?' জবাবা তারা বলেছিল, 'যার টাকা বা জিনিসপত্র নেই সে নিঃস্ব।' নবী (সাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে তারা নিঃস্ব যারা কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা এবং দান-খয়রাত নিয়ে আসবে, কিন্তু অপমান, অপবাদ, সম্পদ গ্রাস, রক্তপাত এবং অন্যদের মারধর করার কাজ সহকারে আসবে। নির্যাতিতদের প্রত্যেককে তার সৎকর্ম থেকে পুরস্কৃত করা হবে। যদি ন্যায়বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে তার সৎকর্ম শেষ হয়ে যায়, তা হলে তাদের পাপ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' ধারণাটি এতটাই স্পষ্ট যে, এর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এমনকি যারা তাদের সহকর্মীদের উপর অন্যায় করে তারা তাদের নিজেদের উপাসনার ফজিলতও উপভোগ করতে পাবে না। অধিকন্তু, তারা যাদের উপর অন্যায় করেছে তাদের পাপ তারা বহন করবে। এটি ঐশ্বরিক ধর্ম মানব সম্পর্কের গুরুত্ব তুলে ধরে। মানবজাতিকে যে মহান সম্মান প্রদান করেছে তা প্রদর্শন করে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের সবচেয়ে মহান ইবাদত—নামাজে হাজার হাজার লোককে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় নবী (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ একটি ছোট শিশুর অবিরাম কান্না শুনতে পায়, তা হলে নামাজ সংক্ষিপ্ত করা উচিত। কারণ এই ভয়ে ছিল না যে, শিশুটি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে, বরং এটি শিশুর মায়ের উপর যে যন্ত্রণা ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে তা প্রশমিত করার জন্য। এটি একজন মায়ের হৃদয়ের আবেগ এবং যন্ত্রণার প্রতি ধর্মের গভীর মনোযোগ ও দৃষ্টিকে চিত্রায়িত করে।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, শেষ বিচারের দিন, যখন মানুষকে তার কর্মের জন্য জবাবদিহি চাওয়া হবে, তখন আল্লাহ তাদের স্থান গ্রহণ করবেন যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে । তাদের কষ্টকে তিনি নিজের বলে মনে করবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন: 'হে মানুষ! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে যাওনি।' মানুষ বলবে: 'হে আমার প্রভু, আমি কীভাবে তোমাকে দেখতে যাব?' আল্লাহ উত্তর দেবেন: 'তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি? যদি তুমি তা করতে, তা হলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে।' আবার, আল্লাহ বলবেন: 'হে মানুষ! আমি তোমার কাছে খাবার

চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার খেতে দাওনি।' মানুষ উত্তর দেবে: 'হে আমার প্রভু, তুমি জগতের প্রভু। আমি তোমাকে কীভাবে খাওয়াবো?' আল্লাহ বলবেন: 'তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি? যদি তুমি তা করতে, তা হলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে।' আবারও আল্লাহ বলবেন: 'হে মানুষ! আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, অথচ তুমি আমাকে পান করাওনি।' মানুষ বলবে: 'হে আমার প্রভু, তুমি সকলের পালনকর্তা। আমি তোমাকে কিভাবে পানি দিতে পারি?' আল্লাহ বলবেন: 'তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা তৃষ্ণার্ত ছিল, অথচ তুমি তাকে পানি দাওনি? যদি তুমি তা করতে, তা হলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে।' এই গভীর শিক্ষা ইসলামের করুণা, ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কতটা জোর দেয়। এটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অন্যদের যত্ন নেওয়া কেবল দয়ার কাজ নয় বরং এটি একটি ইবাদতের রূপ, যা আমাদেরকে স্বয়ং স্রষ্টার নিকটবর্তী করে।

ছিন্নভিন্ন পারিবারিক বন্ধন

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে সবকিছুই বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণে পরিচালিত হয়। এখানে সবকিছুই লাভ-লসের হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং বাস্তবায়ন করা হয়, প্রায়শই যোগসাজশের মাধ্যমে। মানুষের সম্পর্ক সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যার প্রাধান্য দৃশ্যমান। লাভের পরিমাণ সংযোগ না সম্পর্কের মূল্য নির্ধারণ করে। পিতামাতা আর্থিকভাবে সাবলম্বী সন্তানদের পছন্দ করেন। অন্যদিকে যারা জীবন সংগ্রাম করে তাদের করুণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। একজন মা হয়তো তার মেয়ের প্রতি আরও বেশি স্নেহ দেখাতে পারেন যারা দ্রুত একজন ধনী বর খুঁজে নিতে পারে বা পেয়ে যায়। আর একজন দরিদ্র সন্তানকে উপেক্ষা করা হয়। সমাজও ধনীদের প্রতি যত্নশীল, মনোযোগী যারা তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে জাহির করে এবং দরিদ্রদের এড়িয়ে চলে। এমনকি সরকারি কর্মচারীরাও দাম্ভিক অভিজাতদের পক্ষ নেয়, অভাবীদের সাথে যোগাযোগ করতে অনিচ্ছুক ।

জীবনের কষ্টের বোঝা সহ্য করার পরও, অনেক বাবা-মা তাদের নিজের সন্তানদের জন্য অভিযোগ প্রকাশ করেন। বয়স্করা তাদের দিন শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে, কিছু নম্র কথা, একটি কোমল স্পর্শ এবং উষ্ণ সাহচর্যের জন্য তারা আকুল থাকে। তবুও, লাভ-লসের অংকে পরিচালিত এই পৃথিবীতে, বয়স্ক বাবা-মাকে প্রায়শই খাবার এবং ওষুধের বোঝা-নির্গমনকারী সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। কারণ অর্থনৈতিকভাবে তারা আর অবদান রাখে না। অনেক শিশু তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে সরাসরি ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে, ভালোবাসার কারণে নয়, বরং এটা তারা করে সামাজিক বিচারের ভয়ে। অনেকেই তাদের জীবনের শেষ দিনগুলি হাসপাতাল বা বৃদ্ধাশ্রমে কাটায়, কেবল পরের চিন্তা হিসেবে। পশ্চিমা দেশগুলিতে, তাদের শরণার্থীর মতো কেন্দ্রে রাখা হয়, অন্যদিকে আমাদের শহরগুলিতে, তারা তাদের শেষ বছরগুলি একই রকম প্রতিষ্ঠানে, একাকী এবং ভুলে যাওয়া অবস্থায় কাটায়। এমনকি যারা তাদের পরিবারের সাথে থাকে তারাও ছায়ায় জীবনযাপন করে, সময়ের ক্ষতির জন্য অপেক্ষা করে। তাদের শেষ ছেলে বা মেয়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বৃদ্ধ বাবা-মা প্রায়শই তাদের বাড়িতে একা হয়ে পড়ে। যারা একসময় তাদের নাতি-নাতনিদের আনন্দময় উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করত তারা হতাশার মুখোমুখি হয়। অনেক ক্ষেত্রে, বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের ঘরের দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ দেখতে পান, যা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন স্থানে পরিণত করে। কিন্তু, ইসলাম এই বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে, পিতামাতার প্রতি সঠিক মনোভাব এবং আচরণের বিস্তারিত রূপরেখা প্রদান করে।

ধর্ম সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে কীভাবে আলাপ আলোচনা করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত শিক্ষা দেয় - তা সে বাবা-মা, সন্তান, স্বামী-স্ত্রী, প্রতিবেশী, প্রবীণ, এতিম বা শাসক যেই হোক না কেন। পিতামাতার ক্ষেত্রে, ইসলাম বিশ্বাসীদের বিশেষভাবে আদেশ দেয় যে, যেন তারা তাদের সঙ্গে সদয় এবং সম্মানের সঙ্গে আচরণ করবে, বিশেষ করে বৃদ্ধ বয়সে। কুরআনে বলা হয়েছে: ''তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"

যদি তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার কাছে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়, তা হলে তাদের 'উফ'ও বলো না, তাদের সাথে কঠোরভাবে কথা বলো না। বরং বলো:

''হে আমার প্রভু! তাদের প্রতি দয়া করো যেমন তারা আমাকে তাদের প্রতি দয়া ও বিনয়ের সাথে লালন-পালন করেছে।" (কুরআন ১৭:২৩-২৪)

অধিকন্তু, আল্লাহ আদেশ করেন:

''আমার প্রতি এবং তোমাদের পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।" (কুরআন ৩১:১৪)

সম্মান এবং সদাচারের মাধ্যমে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জন না করে আল্লাহর অনুগ্রহ অর্জন করা অসম্ভব। নবী (সা:) এই কথার উপর জোর দিয়ে বলেছেন: ''পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে তাঁর ক্রোধ নিহিত।"

সমসাময়িক সমাজে, এমনকি মহিলারাও প্রায়শই মাতৃত্বের অপরিসীম মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হন। খুব কম মা তাদের সন্তানদের গর্ভধারণ, লালন-পালন এবং লালন-পালন করার জন্য গর্বিত হন। অনেকেই সন্তান জন্মদান এবং অভিভাবকত্বকে মহৎ দায়িত্ব হিসেবে না দেখে তারা এগুলোকে বোঝা হিসেবে দেখেন। অভিভাবকত্ব গ্রহণে ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বিধা রয়েছে, যা মূল্যবোধের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করছে। আর এই আচরণ পরবর্তী প্রজন্মকে লালন-পালনের তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ণ করছে। এমনকি যদি তারা এক বা দুটি শিশুর জন্ম দেয়, তবুও অনেক বাবা-মা প্রয়োজনীয় যত্ন সহকারে তাদের লালন-পালন করতে সক্ষম হন না। সন্তানের সাথে খেলাধুলা করা, স্নান করানো, খাওয়ানো এবং ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার কাজ সেভাবে করেন না। প্রায়শই তাদের এই ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য সময় হাতে থাকে না।

পরবর্তী ত্রিশ বছরে একটি শিশু যে আর্থিক বোঝা বহন করতে পারে তার উপর ভিত্তি করে, আজকের পৃথিবীতে, অনেকেই জীবন-মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেন। আমাদের সময়ে এটি কোনও অস্বাভাবিক মানসিকতা নয়। এমন একটি দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সন্তান ধারণের অর্থনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা সন্তান জন্ম দেবে না গর্ভপাত করবে। এ জাতীয় হিসেবে নিকেষ আজ অতি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে! উচ্চ সাক্ষরতা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরিচিত রাজ্য কেরালায়ও প্রতিদিন কমপক্ষে ১,৫০০

শিশু গর্ভপাত করা হয়। ফলস্বরূপ, আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্রে নয় বরং হাসপাতালের অপারেটিং রুমের ভেতরে সংঘঠিত। এর সমাধান হিসেবে, ইসলাম একটি দৃঢ় নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে।

নবী মুহাম্মদের সময়, অনেক গোত্র কন্যা সন্তানের জন্মকে লজ্জাজনক মনে করত। এই গোত্রের এক ব্যক্তি একবার নবীর কাছে এসে একটি ভয়ঙ্কর গল্প বর্ণনা করলেন। তার একটি কন্যা সন্তান ছিল, এবং যখন মেয়েটি হাঁটার মতো বয়সে পরিণত হয়েছিল, তখন তিনি তাকে স্নান করিয়ে পোশাক পরিয়ে মরুভূমিতে নিয়ে যান। সেখানে, তিনি একটি গর্ত খনন শুরু করেন। তার নিষ্পাপ কন্যা, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, তার কপাল এবং দাড়ি থেকে বালির কণা তার ছোট হাত দিয়ে মুছে ফেলে। যখন গর্তটি যথেষ্ট গভীর হয়ে যায়, তখন তিনি তাকে তাতে ঠেলে দেন। যখন সে তার বাবার জন্য চিৎকার করে, তখন তিনি গর্তটি বালি দিয়ে পূর্ণ করে দেন, তাকে জীবন্ত কবর দেন। লোকটি সম্পূর্ণ উদাসীনতার সাথে এই ভয়াবহ ঘটনাটি বর্ণনা করেন, কিন্তু তা শুনে নবীর চোখ অশ্রুতে ভরে যায়। তার গাল বেয়ে তার দাড়ি ভিজে যায়। নিষ্পাপ কন্যা সন্তানের জন্য তার শোক সেই মুহূর্তকে ছাড়িয়ে যায় —তার দুঃখ ওহীর (ঐশী প্রত্যাদেশ) অংশ হয়ে উঠে। কুরআন এই শক্তিশালী শব্দগুলির মাধ্যমে এই নিষ্ঠুরতার নিন্দা করে:

‘‘এবং যখন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাকে কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?’’ (কুরআন ৮১: ৮-৯)।

এই আয়াতটি মানব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশ্বাসীদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তরঙ্গ তৈরি করেছে। আজও, চৌদ্দ শতাব্দী পরেও, এর প্রভাব সামাজিক জীবনে গভীরভাবে অনুরণিত হচ্ছে। একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হল যে, মুসলমানদের এখনও শিশুহত্যা থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

শিশুদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে ইসলাম স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে, শিশুরা এক একটি আশীর্বাদ, বোঝা নয়। এই শিক্ষাগুলি পালন করা একটি ধর্মীয় এবং অনুভূতিমূলক বিষয়, বরং এর পরিবর্তে কীভাবে ধর্ম তাদের লালন-পালনকে কেবল সহজাত প্রবৃত্তির নৈতিক কর্তব্যের উপর ছেড়ে দেয় না, যখন তাদের লঙ্ঘন করা পাপ এবং শাস্তিযোগ্য উভয়ই বলে

বিবেচিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলাম শিশুদের প্রতি করুণা এবং দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। নবী মুহাম্মাদ (সা:) তাদের সঙ্গে ভালোবাসা এবং স্নেহের সাথে আচরণ করার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি একবার তাঁর এক নাতিকে চুম্বন করেছিলেন, এবং আকরা ইবনে হাবিস নামে এক ব্যক্তি যিনি এটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ''আমার দশটি সন্তান আছে, কিন্তু আমি তাদের কাউকে কখনও চুম্বন করিনি।" জবাবে, নবী (সা:) বলেছিলেন, ''যে দয়া দেখায় না সে দয়া পাবে না।"

অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন নবীর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)। একবার এক গ্রামবাসী নবীর কাছে এসে বলল, ''তুমি বাচ্চাদের চুম্বন করো? আমরা তাদের চুম্বন করি না।" নবী উত্তর দিলেন, ''আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় থেকে দয়া সরিয়ে দেন তবে আমি কী করতে পারি?" নবী আরও উপদেশ দিয়েছিলেন, ''তোমাদের সন্তানদের ভালোবাসো, তাদের প্রতি দয়া করো, তাদের প্রতি দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো।"

এমনকি বিবাহ, যা একটি পবিত্র বন্ধন হিসেবে বিবেচিত, আধুনিক যুগে বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়েছে। অনেকেই সাহচর্য এবং আজীবন অংশীদারিত্বের জন্য নয় বরং আর্থিক লাভের কথা মাথায় রেখে জীবনসঙ্গী খোঁজেন। যাইহোক, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, বিবাহ বিশুদ্ধ আবেগ - ভালোবাসা, করুণা এবং পারস্পরিক যত্নের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। গণিতে, এক যোগ এক সমান দুই কিন্তু ইসলামী বৈবাহিক জগতে, একজন স্বামী এবং স্ত্রী এক হয়ে যান। তাদের সম্পর্ক একটি পবিত্র এবং রূপান্তরকারী বন্ধন, যেমন দুটি মহান নদী একটি একক, শক্তিশালী নদীতে মিশে যায়। ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন, যা একটি নিরাপদ, পরিপূর্ণ এবং তৃপ্তিদায়ক মিলন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনি এবং নৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করেছে। পবিত্র কুরআন এই সম্পর্ককে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছ,—

''নারীরা পুরুষদের জন্য একটি পোশাক, এবং পুরুষরা হচ্ছে নারীদের জন্য পোশাক স্বরূপ।" (কুরআন ২ ১৮৭)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং পারস্পরিক সহায়তার উপর জোর দেয়। এটি আরও ঘোষণা করে—

''তোমরা একে অপরের সাথে একটি দৃঢ় অঙ্গীকার দ্বারা সংযুক্ত।" (কুরআন ৪:২১)

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, বিবাহের নীতিমালা মেনে চলা পুণ্যের এবং ফলপ্রসূ। অন্যদিকে এগুলো লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আধুনিক অগ্রগতি, যেমন বৈদ্যুতিক আলো যা রাতকে দিনে পরিণত করে, আমাদের দেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, তবুও অনেকেই তাদের চারপাশে কী আছে তা সত্যিকার অর্থে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। প্রকৃত অন্ধত্ব কেবল শারীরিক দৃষ্টিশক্তি হারানো নয় বরং অন্তরের চোখ দিয়ে দেখার অক্ষমতা। একইভাবে, প্রযুক্তি আমাদের হাজার হাজার মাইল দূরের শব্দ শুনতে সক্ষম করেছে ঠিকই কিন্তু অনেকেই তাদের কাছের লোকদের সত্যিকার অর্থে শোনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলস্বরূপ, প্রতিবেশীরা প্রায়শই একে অপরের কাছে অপরিচিত থাকে। ইসলাম এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার তীব্র নিন্দা করে। নবী মুহাম্মদ (সা:) প্রতিবেশী সম্পর্কের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বলেছেন: ''যে ব্যক্তি স্রষ্টা এবং পরিকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" ''কেউ প্রকৃত মুমিন (বিশ্বাসী) হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে।" ''যে ব্যক্তি পেট ভরে ঘুমায় এবং তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে, সে মুমিন (বিশ্বাসী) নয়।"

আতিথেয়তা ঈমানের আরেকটি অপরিহার্য দিক। যদিও আজকাল কেউ কেউ অতিথিদের বোঝা হিসেবে দেখে, ইসলাম আতিথেয়তাকে সরাসরি বিশ্বাসের (ঈমান) সাথে যুক্ত করে। নবী (সা:) বলেছেন: ''যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে।" ''যে ব্যক্তি অতিথিকে স্বাগত জানায় না, তার কোন কল্যাণ হবে না।"

পবিত্র কুরআনে প্রকৃত মুমিনদের চরিত্র বর্ণনা করে বলা হয়েছে: ''তারা তাদের কাছে যারা হিজরত (জায়গা পরিবর্তন করা) করে এসেছে তাদের ভালোবাসে এবং তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য লোভ করে না; এমনকি তারা তাদের নিজেদের চেয়েও তাদেরকে বেশি প্রাধান্য দেয়, যদিও দারিদ্র্য তাদের নিজস্ব ভাগ্য। এবং যারা- নিজেদের লোভ থেকে রক্ষা পাবে, তারাই সফল হবে।"

উপরের বর্ণনা নিঃস্বার্থতা এবং উদারতার গুরুত্ব তুলে ধরে যে, মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, ইসলাম এমন একটি সমাজ

বিনির্মাণের আহ্বান জানায় যা করুণা, বিশ্বাস এবং শক্তিশালী মানবিক সম্পর্কের উপর নির্মিত, যাতে কেউ অবহেলিত বা ভুলে না যায়।

স্বার্থপরতার সমাপ্তি

বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে। প্রযুক্তির প্রসার ঘটেছে। জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যন্ত্রের আধিপত্য দেখা যাচ্ছে। যন্ত্রই বেশিরভাগ কাজ দখল করে নিয়েছে। ফলে হাতের কাজ-কর্মের প্রয়োজন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সবকিছুই এখন আরও সহজলভ্য। জীবনযাত্রার মান ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে। তবুও, ক্ষুধা অনাহার অব্যাহত রয়েছে। আমেরিকায় কুকুররা মাটন খায় অথচ সোমালিয়ায় মানুষের খাওয়ার মতো মাংস বা সবুজ শাকসবজি নেই। ইউরোপে কুকুরদের রেশমের পোশাক পরিয়ে কবর দেওয়া হয় কিন্তু আফ্রিকায়, মানুষের মৃতদেহ কুকুররা খায়! পৃথিবী ক্ষুধার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে পড়েছে - এটা নতুন কিছু নয়। মানুষ যা পায় তাই আঁকড়ে থাকে, প্রয়োজনে চুরির আশ্রয় নেয়। শক্তিশালীরা সবকিছু ব্যবস্থা করে নেয়, দুর্বলরা দারিদ্র্যের মধ্যে হাবুডুবু খায়। ধনীরা তাদের সম্পদ জাহির করে, আর দরিদ্ররা অনাহারে থাকে। কারণ স্পষ্ট: স্বার্থপরতা রাজত্ব করে। মানুষের ব্যক্তিগত জগৎ প্রসারিত হয়েছে, তবুও তাদের হৃদয় সংকীর্ণ রয়ে গেছে। লোভ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তীক্ষ্ণ করেছে, তারা কেবল যা চায় তা দেখতে বাধ্য করেছে। তারা কেবল নিজের কথা ভাবে, তাদের চারপাশের লোকদের কথা উপেক্ষা করে। তারা দুঃখীদের কান্নার প্রতি কান বন্ধ করে। অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করাকে অপচয়, এমনকি রসিকতা হিসেবেও দেখা হয়।

প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব স্বার্থপর বুদবুদের মধ্যে বাস করে। কেউ এর বাইরে পা রাখে না। ফলস্বরূপ, কেবলমাত্র খণ্ডিত, স্বার্থকেন্দ্রিক অস্তিত্বের জন্য কোনও একক পৃথিবী নেই। প্রচুর সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, ১০ কোটিরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। এমনকি তাদের মৌলিক চাহিদাও পূরণ করতে অক্ষম। উন্নত জ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি দ্বারা পরিচালিত এই পৃথিবীতে ১৩৫ মিলিয়ন মানুষ এখনও নিজের নাম লিখতে বা পড়তে পারে না। ইতিহাসে কি কখনও এমন সময় এসেছে

যখন অভাবী, অসহায়, এতিম এবং নিঃস্বদের এত অবহেলা করা হয়েছিল? একজনকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে যে, আধুনিক সভ্যতা, ভোগ-বিলাসে এত আচ্ছন্ন, সত্যিই কি এগিয়েছে - নাকি এটি কেবল চোখ বন্ধ করার শিল্পকে নিখুঁত করেছে?

দয়া-মায়ার বিন্দুমাত্র চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। ইসলাম স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস এবং পরকালের প্রতি অটল, অবিচল সচেতনতার উপর ভিত্তি করে জীবনযাপনের মাধ্যমে এই ধরনের নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটায়। এটি শিক্ষা দেয় যে, করুণা, মায়া-মমতা সকল মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত। নবী মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন: ''যারা মানুষের প্রতি করুণা দেখায় না তাদের প্রতি স্রষ্টা করুণা করবেন না।" তিনি আরও বলেছেন: ''পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তা হলে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" ধর্ম দাবি করে যে, আমরা সমাজের নীচু স্তরের মানুষদের প্রতি সীমাহীন করুণা প্রদর্শন করি, অর্থাৎ এতিম, দরিদ্র, অভাবী এবং অসহায়দের প্রতি। ইসলাম এই পদ্ধতিকে সরাসরি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পরকালে মুক্তির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। আল্লাহ কুরআনে জিজ্ঞাসা করেন:

''তুমি কি তাকে দেখেছো যে 'শেষ বিচার' অস্বীকার করে? সে তো সেই ব্যক্তি যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয় এবং দরিদ্রদের খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করে না। অতএব সেই 'মুনাফিকদের' জন্য দুর্ভোগ, যারা নামাজ পড়ে, কিন্তু তাদের নামাজ সম্পর্কে গাফেল থাকে; যারা 'কেবল' লোক দেখানো করে এবং ''সামান্য সাহায্যও' দিতে অস্বীকার করে।" (কুরআন ১০৭: ১-৭)

সাধারণভাবে, একজন নাস্তিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি স্রষ্টাকে অস্বীকার করেন এবং ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। কিন্তু এখানে, ধর্মকে অস্বীকার করার অর্থ কী তা পুনর্বিবেচনা করার একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে। পবিত্র কুরআন অস্বীকারকারীকে কেবল বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যানকারী হিসাবেই চিহ্নিত করে না, বরং এমন একজন হিসাবেও চিহ্নিত করে, যে এতিম ও দরিদ্রদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে অবহেলা করে, তারা আসলে নিজেদের প্রার্থনায় (নামাজে) অবহেলা করে। এবং তারা কেবল অন্যদের দেখানোর জন্য প্রার্থনা, উপসানা করে। এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে

প্রার্থনার অনুপ্রেরণামূলক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির অভাব থাকে, যার ফলে ছোটখাটো দয়া করার ইচ্ছাও তার থাকে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠতে হবে ভালোবাসা, করুণা, প্রেম-প্রীতি এবং দানশীলতার উপর। স্রষ্টা এবং মানুষের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ়, নিরাপদ এবং ন্যায়বিচার ও যত্নের উপর ভিত্তি করে।

মানবতার ঐক্য

ইসলাম সকল মানুষের ঐক্য ও সাম্যের উপর জোরালোভাবে জোর দেয়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। এই দিক দিয়ে, জাতি, বর্ণ, জাতীয়তা, ভাষা, যুগ বা লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমান ভাই-বোন। সকলেই একই পিতামাতার সন্তান। আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন:

''হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে তাকওয়াবান বা আল্লাহভীরু।" (কুরআন ৪৯:১৩)

নবী মুহাম্মাদ (সা:) এই বার্তাটির উপর জোর দিয়ে বলেছেন: ''তোমাদের সকলের একজনই প্রভু। তোমাদের সকলের একজনই পিতা। তোমরা সবাই আদম থেকে এসেছ, আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছিলেন: ''চিরুনির দাঁতের মতো সকল মানুষ সমান।" এই ঘোষণাগুলি কেবল তাত্ত্বিক ছিল না। নবীজী সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। যখন তিনি তাঁর মিশন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তখন আরব সমাজ গভীরভাবে প্রোথিত সামাজিক অস্থিরতা - দাসত্ব, গোত্র, শ্রেণীবিন্যাস এবং বৈষম্য দ্বারা জর্জরিত ছিল। সেখানে ছিল প্রভু এবং দাস, অভিজাত এবং বহিষ্কৃত। ইসলাম এই প্রচলিত ব্যবস্থাকে একটি দৃঢ় বিব্রতি দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল। ''তোমরা সবাই সমান।" প্রাথমিকভাবে, অনেকেই এই চরম ধারণাটি মেনে নিতে অসুবিধা বোধ করেছিলেন। একবার, নবীর ঘনিষ্ঠ সাহাবী আবু যার গিফারি এবং ইসলাম

গ্রহণকারী একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস বিলাল ইবনে রাবাহের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। তীব্র উত্তেজনার মধ্যে, আবু যার বিলালকে 'একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার পুত্র' বলে অপমান করেন। বিলাল গভীরভাবে আহত হন এবং বিষয়টি নবীর কাছে বলা হয়। নবী তৎক্ষণাৎ আবু যারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ''তুমি কি তার মায়ের কারণে তাকে অপমান করেছিলে?" আবু যার যখন স্বীকার করেন, তখন নবী জবাব দেন, ''তোমার মধ্যে এখনও অজ্ঞতার (জাহিলিয়াতের) চিহ্ন রয়েছে। তোমার হৃদয়ে ইসলাম এখনও পূর্ণ হয়নি। তোমাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।" আবু যার গভীরভাবে অনুতপ্ত হয়ে মাটিতে গাল রেখে বিনীত কণ্ঠে বিলালকে বলেন, 'বিলাল, আমার মুখের উপর পা রাখো, আমি যে ভুল করেছি তার শাস্তি দিতে।' ক্ষমাপ্রার্থীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ বিলাল উত্তর দেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করছি।' এই মুহূর্তটি ইসলামের বিপ্লবী চেতনাকে প্রতিফলিত করে, যে সমাজ একসময় জাতি ও মর্যাদার দ্বারা বিভক্ত ছিল, সাম্য, অনুতাপ এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত হচ্ছিল।

ইসলাম তার অবস্থানে আপোষহীন: কারোরই মানবিক সমতার নীতি থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, পবিত্র কুরআনে নবীর (সা:) নরমসুরে সমালোচনার একমাত্র উদাহরণ হল, আল্লাহর প্রতি তাঁর ভক্তির কোনও ত্রুটি বা ব্যক্তিগত দোষের কারণে নয়। বরং, এটি তাঁর অনুসারীদের একজনের প্রতি তাঁর আচরণের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে ছিল। অনুসারীর কর্মকাণ্ডের কারণে নয়, বরং তাঁর সামাজিক অবস্থানের কারণে। একবার, নবী (সা:) কুরাইশদের বিশিষ্ট নেতাদের সাথে, আবু জাহেল, আবু লাহাব, উতবা, শায়বা এবং অন্যান্যদের সাথে গুরুগম্ভীর কথোপকথনে লিপ্ত ছিলেন। এই রকম সাক্ষাত চলাকালীন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম নামে এক অন্ধ ব্যক্তি, নবীর কাছে কিছুনির্দেশনার জন্য আসেন। যেহেতু নবী (সা:) অভিজাতদের প্রতি ইসলামের বার্তা উপস্থাপনের উপর মনোনিবেশ করেছিলেন, আশা করেছিলেন যে, তাদের গ্রহণযোগ্যতা অন্যদের প্রভাবিত করবে - তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আবদুল্লার প্রতি মনোযোগ, ধ্যান দেননি। আবদুল্লাহ জন্ম থেকেই অন্ধ, নবীর মুখের ভাব ভঙ্গি দেখতে পায়নি, এমনকি সে বুঝতেও পারেনি যে, তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। তবুও, এই মুহূর্তটি স্রষ্টার দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্ধ ব্যক্তির

অসচেতনতা সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে নবীর প্রতিক্রিয়ার গুরুত্বকে কমাতে পারেনি। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, একজন আন্তরিক, নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী, এমনকি অদৃশ্য বা অলক্ষিত হলেও, ক্ষণিকের জন্য উপেক্ষিত ছিলেন। প্রতিক্রিয়ায়, আল্লাহ কুরআনে আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন।

এটি ছিল তাঁর অন্তিম রসূলের (বার্তাবাহক) প্রতি স্রষ্টার মৃদু অথচ গভীর তিরস্কার। এটি ছিল একটি ঐশ্বরিক স্মারক যে, প্রতিটি ব্যক্তি, তার মর্যাদা বা ক্ষমতা যাই হোক না কেন, সবাই সম্মান, মনোযোগ ও মর্যাদার যোগ্য। এই ঘটনাটি মানবতার সকলের জন্য একটি স্থায়ী সতর্কীকরণ হিসেবে কাজ করবে: ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অন্যায় বা অবহেলা বরদাস্ত করেন না। কুরআন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে, সাম্যের চেতনা প্রতিটি বিশ্বাসীর মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হওয়া উচিত। তাদের দৈনন্দিন জীবনে তা স্পষ্ট হওয়া উচিত। আসুন আমরা এই সাম্যের একটি শক্তিশালী প্রতীক, পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র স্থান, পবিত্র কাবা, সম্পর্কেও চিন্তা করি। প্রতিদিন, এক কোটিরও বেশি মানুষ দিনে এর দিকে মুখ করে পাঁচবার প্রার্থনা (নামাজ) করে। যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন তারা শেষবারের মতো এর দিকে মুখ করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, অসংখ্য বিশ্বাসীকে তাদের দেহ স্রষ্টার এই পবিত্র ঘরের দিকে মুখ করে সমাহিত করা হয়েছে। এটি ইসলামে ভক্তি ও ঐক্যের চিরন্তন কেন্দ্র হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এই কাবার কাঠামোর উপর থেকে, একসময় একজন ব্যক্তি এক আহ্বান জানিয়েছিলেন, বিজয়ের একটি শক্তিশালী ও ঐতিহাসিক ঘোষণা। এই মুহূর্তটি ছিল সেই মুহূর্ত যখন নবী মুহাম্মাদ (সা:) এবং তাঁর সাহাবীরা, যারা একসময় দুঃখ ও বেদনায় তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু বিজয়ের এই মুহূর্তে, নবী বিপ্লবী কিছু কাজ করেছিলেন। তিনি কাবা শরীফে আরোহণ করে ঘোষণা (আজান) দেওয়ার জন্য অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত বংশের কোনও নেতাকে বেছে নেননি। তিনি কোনও সেনাপতি, উপজাতি প্রধান বা অভিজাত ব্যক্তিকে এ কাজে নিযুক্ত করেননি। পরিবর্তে, তিনি আফ্রিকান বংশোদ্ভূত বিলাল ইবনে রাবাহকে কাবার উপরে দাঁড়ানোর জন্য এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে নামাজের আজান দেওয়ার জন্য বাছাই করেছিলেন। এটি এমন একটি মুহূর্ত ছিল যা

সেই সমাজের বর্ণগত ও সামাজিক অহংকারের শেষ অবশিষ্টাংশগুলিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল।

আমি আরও একটি বিষয় তুলে ধরতে চাই: এই পৃথিবীতে একজন মানুষ সবচেয়ে বড় কাজ কী করতে পারে সেই প্রশ্নটি। সাধারণত, মানুষ ধরে নেয় যে, স্রষ্টার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল উপাসনা, পাহাড়ের চূড়ায় একাকী ভক্তি, অথবা কঠোর আধ্যাত্মিক অনুশীলন। কিন্তু ইসলাম অন্য কিছু শিক্ষা দেয়। স্রষ্টা প্রকাশ করেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হল তাঁর সৃষ্টির সেবা করা, চারিপাশের মানুষদের আন্তরিকভাবে সাহায্য করা, শুধুমাত্র স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা, অন্যদের কাছ থেকে স্বীকৃতি বা প্রশংসা প্রত্যাশা করা নয়।

এইভাবে, ইসলাম সামাজিক জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য নির্দেশিকা স্থাপন করেছে এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, সম্পদ কীভাবে অর্জন করা উচিত। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, সম্পদ শেষ পর্যন্ত আল্লাহর, এবং মানুষকে কেবল সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম কীভাবে সম্পদ অর্জন করা উচিত এবং কীভাবে তা অর্জন করা উচিত নয় তার স্পস্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। কীভাবে সম্পদ হস্তগত করা করা যেতে পারে এবং কোন ধরণের সম্পদ দখল করা অন্যায়। কীভাবে এটি ব্যয় করা উচিত এবং কীভাবে এর অপচয় করা উচিত নয়। ইসলামে সম্পদ অর্জনকে পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি পুণ্যের কাজ, যখন এটি বৈধভাবে করা হয়। কারণ মানুষ পৃথিবীতে স্রষ্টার আমানতদার। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হিসেবে মানুষের কর্তব্য হল পৃথিবীকে সমৃদ্ধ, ফলপ্রসূ এবং সমৃদ্ধ করা। সত্য ইবাদতের (উপাসনা) মধ্যে রয়েছে বিশ্বের প্রতি ইতিবাচক অবদান রাখা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এর মঙ্গল নিশ্চিত করা। নবী মুহাম্মাদ (সা) সৎ কাজের মূল্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি একবার বলেছিলেন: 'যখন একজন মুমিন (বিশ্বাসী) শারীরিক পরিশ্রম থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার পাপ ক্ষমা করা হয়।'

আরেকবার, নবী (সাঃ) তাঁর এক সাহাবীর সাথে করমর্দন করলেন এবং লক্ষ্য করলেন যে লোকটির হাত রুক্ষ এবং অবশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার হাতের কি হয়েছে?' লোকটি উত্তর দিল, 'এগুলো কঠোর পরিশ্রমের চিহ্ন।' তাঁর এই কথা শুনে নবী (সাঃ) লোকটির হাত ধরে চুম্বন করলেন এবং বললেন, 'এই

হাতদুটো আল্লাহ ও তাঁর রসূল খুবই ভালোবাসেন।' এই সুন্দর অঙ্গভঙ্গি শিক্ষা দেয় যে, কঠোর, সৎ শ্রমের ক্ষত বা চিহ্ন ইসলামে সম্মানিত। যাইহোক, যদিও ইসলাম সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করে না যা সমাজের ক্ষতি করে। ইসলাম অন্যায়, শোষণ বা অনৈতিক উপায়ে অর্জিত উপার্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। অধিকন্তু, ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে। সম্পদের ব্যবহার অবশ্যই বৃহত্তর সমাজের অবস্থা বিবেচনায় নিতে হবে। ইসলাম দৃঢ়ভাবে অপচয়, নষ্ট ও বিলাসিতায় লিপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।

যাইহোক, বর্তমানে সমাজ ক্রমশ ভোগবাদী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ যা কিছু দেখে তা পেতে চায়। দখল করার জন্য জোর দেয়। তারা কোনও রকম বাধা ছাড়াই বস্তুগত জিনিসের সঙ্গে আঁকড়ে থাকে। প্রকৃতিকে তার সীমা পর্যন্ত শোষণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতের জন্য বা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার জন্য খুব কমই চিন্তা করা হচ্ছে। দয়া ছাড়াই পৃথিবী থেকে তার সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সংযম ছাড়াই আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার তথাকথিত 'অগ্রগতি' - বিপদজনক হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। এই ধরনের আচরণ কেবল প্রাকৃতিক জগতকেই নয়, বরং মানব জীবনের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ফেলেছে। এর পরিণতি দুনিয়া জুড়ে দৃশ্যমান: দূষিত বায়ু, দূষিত জল, অবনমিত মাটি, এবং শব্দ ও বিশৃঙ্খলা মানুষের শান্তি কেড়ে নিচ্ছে। যেমন কুরআন সতর্ক করে:

''মানুষের হাতের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে তিনি তাদের কৃতকর্মের কিছু আস্বাদন করাতে পারেন, যাতে তারা (সৎকর্মের দিকে) ফিরে আসে।" (কুরআন ৩০:৪১)

ইসলাম মহাবিশ্ব এবং এর সকল বাসিন্দার প্রতি করুণা ও মায়ার শিক্ষা দেয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) গভীর উদাহরণের মাধ্যমে এই সর্বজনীন করুণার কথা তুলে ধরেছেন।

তিনি একবার বলেছিলেন যে, একজন মহিলাকে জাহান্নামে দণ্ডিত করা হয়েছে কারণ তিনি একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে তাকে খেতে দেননি। অন্যদিকে, অন্য একজন মহিলাকে তার অনেক পাপ সত্ত্বেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কারণ

তিনি একটি কুকুরকে কুয়ো থেকে পানি তুলে তার তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। এই গল্পগুলি সৃষ্টির শ্রেণিবিন্যাসে তাদের অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে সকল জীবের প্রতি করুণা ও দয়া দেখানোর গুরুত্বের উপর জোর দেয়। এই শিক্ষা স্পষ্টভাবে প্রাণী এবং প্রকৃতির প্রতি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি করতে নিষেধ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি সাপকে হত্যা করা যা তার গর্তে ফিরে যাচ্ছে অথবা বিনা কারণে গাছে পাথর ছুঁড়ে মারা উভয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুসংহত জীবন ব্যবস্থা। এটি তিনটি প্রাথমিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে: সৃষ্টিকর্তার সাথে, মানুষের সঙ্গে এবং পরিবেশের সাথে। ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য দিকনির্দেশনা, নীতিগত নীতি এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। এমনকি ক্ষুদ্রতম সামাজিক অঙ্গভঙ্গিতেও, ইসলাম প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে থাকে।

নবী (সা:) বন্ধুর সাথে দেখা করার সময় একজন ব্যক্তির কেমন আচরণ করা উচিত তা শিখিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন যে, হাসিমুখে কাউকে অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে একটি দানশীলতার (সাদকা)কাজ। আপনার ভাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকানো একটি মহৎ, আধ্যাত্মিক কাজ বলে বিবেচিত হয়। ইসলামও অভিবাদনের একটি সার্বজনীন রূপ বা অ্যাপ্রোচ নির্ধারণ করেছে। যখন মানুষ দেখা করে, তখন ইসলাম তাদের বলতে উৎসাহিত করে: 'আসসালামু আলাইকুম'। এর বাংলা অর্থ 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' 'শুভ সকাল' বা 'শুভ সন্ধ্যা'-এর মতো বাক্যাংশের বিপরীতে, যা সময় বা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে - কঠিন পরিস্থিতিতে অসম্মানজনক বা অনুপযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু ইসলামী অভিবাদন কালজয়ী ও অর্থবহ বলে বিবেচিত। মনে করুন যে, কেউ যন্ত্রণায় রাত কাটিয়েছে বা প্রিয়জনের জন্য শোকাহত ব্যক্তিকে 'শুভ সকাল' বলা হচ্ছে। এই ধরনের অভিবাদন, যদিও ভদ্র, কিন্তু আবেগের দৃষ্টিতে ভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। উল্টোদিকে, 'আসসালামু আলাইকুম' হল কল্যাণ কামনা করা এবং স্বর্গীয় শান্তির জন্য একটি আন্তরিক প্রার্থনা। আর এই অভিবাদন প্রতিটি সময়, স্থান ও মানসিক অবস্থার জন্য উপযুক্ত। ইসলামের দিকনির্দেশনার পরিধি আরও ব্যাপক। একজন ব্যক্তির কীভাবে পথচলা উচিত, তা আরও স্পষ্ট। কুরআন মুমিনদেরকে গর্ব বা অহংকার সহকারে চলাফেরা না করার এবং বিনয়ের সঙ্গে মাটিতে পথ চলার

নির্দেশ দেয়। কীভাবে খাওয়া উচিত, ঘুমানো উচিত, জাগ্রত হওয়া উচিত, এমনকি প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত তাও বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম সমাজে আমাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব, অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণ এবং শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি আমাদের মনোভাব সম্পর্কেও স্পষ্ট রূপরেখা দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ইসলাম নির্দিষ্ট নির্দেশনা এবং নৈতিক নীতিমালা প্রদান করেছে। ইসলাম সত্যিই একটি সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা - একটি ঐশ্বরিক কাঠামো যা মানবতাকে সমস্ত চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, আচরণ এবং কাজকে স্রষ্টার আদেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য উৎসাহিত করে।

মনের শান্তির পথ

জ্ঞান এবং বৈষয়িক দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও, মানুষের হৃদয় অস্থির হয়ে থাকে। আধুনিক জীবন, জাগতিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিলাসবহুলতায় পরিপূর্ণ থাকার পরও, মানুষের অভ্যন্তরীণ শান্তি বা প্রকৃত তৃপ্তি প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিবর্তে, এটা মানুষের মনে নতুন নতুন চাওয়া-পাওয়া ও অদম্য আকাঙ্ক্ষার এক অন্তহীন তালিকা, দুয়ার খুলে দিয়েছে। যারা এই চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারে না, তারা ব্যর্থতা ও বঞ্চনার যন্ত্রণায় ভোগে। অন্যদিকে, যারা এগুলি অর্জন করে তারা উদ্বেগ, শূন্যতা বা তাদের যা আছে তা হারানোর ভয়ে আচ্ছন্ন থাকে। ফলস্বরূপ, আজ মানুষ প্রায়শই অস্থির, বিভ্রান্ত এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত। প্রকৃত মনের শান্তি অধরা, মরীচিকা হয়ে উঠেছে। অনেকেই ক্রমাগত চাপ ও মানসিক উদ্বিগ্ন চিন্তা-ভাবনার যন্ত্রণা ভোগ করে। তারা প্রশান্তি খোঁজে কিন্তু তা খুঁজে পায় না। কারও কারও কাছে জীবন একটি বোঝার মতো মনে হতে শুরু করে। এমনকি কেউ কেউ জীবনকে অভিশাপ মনে করে যা তাদের হতাশা ও নিরাশার দিকে ঠেলে দেয়। এই কারণেই কিছু সমাজে, প্রগতি ও অগ্রগতি থাকা সত্ত্বেও, আত্মহত্যার হার উদ্বেগজনকভাবে বেশি হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের কেরালা, একটি রাজ্য যা পূর্ণ সাক্ষরতা এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্য পরিচিত, সেখানেও আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। জ্ঞান ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির ফলে সুখ বা মানসিক সুস্থতা আসেনি। সত্যি কথা বলতে কি, বিশ্বব্যাপী পারিবারিক কারণে আত্মহত্যার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে কেরালা অন্যতম একটি!

প্রতিটি মানুষই চাওয়া-পাওয়া, প্রত্যাশা দ্বারা চালিত হয় এবং তা পূরণ করার জন্য প্রচেষ্টা করে। কিন্তু চাহিদা তথা আকাঙ্ক্ষা মরুভূমির মরীচিকার মতো: সর্বদা কাছে উপস্থিত হয়, কিন্তু কখনও নাগালের মধ্যে আসে না। যখন ব্যক্তির একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়, তখন তার জায়গায় আরেকটি নতুন আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়। সন্তুষ্টি মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে । সাফল্য সব সময় প্রচেষ্টা করার পরেও পাইনা। একজন কৃষক কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রমের পরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। কৌশলগত পরিকল্পনা সত্ত্বেও ব্যবসায়ী ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে পারে। এমনকি শারীরিকভাবে শক্তিশালী ব্যক্তিরাও দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেদেরকে দুর্বল বলে মনে করে। যারা একটি শান্তিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে তারা প্রায়শই তীব্র মানসিক নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হয়।

একদা শক্তি ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর একজন যুবক হঠাৎ করেই বাতরোগে আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন চিকিৎসার চেষ্টা করা হয় - অ্যালোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি - কিন্তু কোনটিই কাজে আসে না। শেষে, সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, রোগটি নিরাময়যোগ্য নয়। সে বুঝতে পারে যে, সে আর কখনও হাঁটতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই, এই কথা তাকে হতাশায় ডুবিয়ে দেয়। এ রকম এক পরিস্থিতিতে, কোনও জাগতিক দর্শন বা আদর্শই তাকে সত্যিকারের সান্ত্বনা দিতে পারে না। এমনকি বিংশ শতাব্দীর মহান বিপ্লবী ভি. আই. লেনিনও যখন বাতরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন তিনি এই হতাশার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। ১৯৭২ সালে মারা যাওয়া সোভিয়েত লেখক আলেকজান্ডার বেকের ব্যক্তিগত সংরক্ষণাগারে (আর্কাইভ) স্ট্যালিনকে পাঠানো লেনিনের একটি চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। চিঠিতে, লেনিন তার শয্যাশায়ী অবস্থায় লেখেন: 'আমার শরীর ক্লান্ত। যদি আমি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি, তা হলে আমি বিষ খেয়ে আমার জীবন শেষ করে দেব। দয়া করে সায়ানাইড (Cyanide) আনুন এবং আমার কাছে রাখুন। এটি আছে জেনেই আমার কিছুটা স্বস্তি হয়।' লেনিনের অনুরোধ স্ট্যালিনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি তার বন্ধু আলেকজান্ডার বেকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রথমে, স্ট্যালিন লেনিনের ইচ্ছা পূরণ করতে রাজি হন, কিন্তু পরে তিনি তার মন পরিবর্তন করেন। তিনি এই আশায় আঁকড়ে থাকেন যে, লেনিন একদিন তার বাকশক্তি ফিরে পাবেন। অন্যদিকে, যারা ঐশ্বরিক

(স্বর্গীয়) নিয়তিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, তারা তাদের স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সান্ত্বনা পান। তাদের হৃদয়ে শান্তি ফিরে আসে। তারা নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়: স্রষ্টাই তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয়, স্বাস্থ্য ও জীবন দিয়েছেন। তিনি যদি কিছু কেড়ে নেন, তবে তা তাঁর ঐশ্বরিক পরিকল্পনার অংশ মাত্র। এই পরীক্ষা, যদিও বেদনাদায়ক, ক্ষণস্থায়ী। যারা ধৈর্য ও বিশ্বাসের সাথে এটি সহ্য করে, তারা পরকালে পুরস্কৃত হবে। তাদের দেওয়া হবে ব্যথা, রোগ ও কষ্টমুক্ত জান্নাত (স্বর্গ)।

মনে করুন, এমন বাবা-মায়ের কথা, যাদের মাত্র একটি সন্তান আছে। আর সেই প্রিয় সন্তান চার বা পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়। এ রকম বাবা-মায়ের দুঃখের গভীরতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই ক্ষতির বেদনা অপরিসীম। এমনকি কার্ল মার্কস, যিনি যুক্তি দিতেন যে, পরিবারের ঐতিহ্যবাহী ধারণা পুঁজিবাদী কাঠামোর ফসল - এবং আদিম কমিউনিস্ট সমাজে, শিশুরা তাদের বাবাদের চিনতেও পারত না। কিন্তু তিনিও ব্যক্তিগত ক্ষতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮৫৫ সালে, তার প্রিয় পুত্র এডগার, যাকে স্নেহে 'মুশ' বলা হত, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আট বছর বয়সী অসাধারণ প্রতিভাবান এডগার ছিলেন মার্ক্সের জীবনের বাতিঘর। সেই সময়, ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে, মার্ক্স তার ছেলের বিছানার পাশে ঘুমহীন রাত কাটিয়ে বলতেন: ''হৃদয় ফুলে উঠছে। মাথা ঘুরছে।'' এডগারের মৃত্যুর পর, মার্কস লিখেছিলেন: 'বেচারা মুশ মারা গেছে... তুমি জানো আমার দুঃখ কত বড়। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু এখন তুমি জানো আসল দুঃখ কী।'

এইরকম গভীর দুঃখের মধ্যেও, যারা ঐশ্বরিক ভাগ্যে (নিয়তি) বিশ্বাস করে তারা একই হৃদয়বিদারক অনুভূতি সহ্য করে - কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া হয় ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের হৃদয় ফিসফিস করে বলে: 'পরম করুণাময় যিনি আমাদের এই সন্তান দিয়েছেন, এবং তিনিই তাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁর অপরিবর্তনীয় আদেশ অনুসারে সবকিছু ঘটে।' তারা বুঝতে পারে যে, তাদের সন্তান স্রষ্টার কাছে ফিরে গিয়েছে। আর স্রষ্টা এমনকি পিতামাতার চেয়েও বেশি প্রেমময়, করুণাময় ও স্নেহশীল। এই মুহূর্তে, অধৈর্য এবং হতাশার কোনও স্থান নেই। তারা বুঝতে পারে যে, প্রকৃত করুণা আত্মসমর্পণ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে সান্ত্বনা খোঁজার মধ্যে নিহিত। যারা ধৈর্য ধরে সহ্য করে তাদের জন্য জান্নাত, চূড়ান্ত পুরস্কার অপেক্ষা করছে।

তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে যে, প্রিয় সন্তান বাড়িতে হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানাবে।

অন্যদিকে, যাদের আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অভাব থাকে তারা যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন অস্থিরতা এবং অসন্তোষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারা উদ্বেগ ও অভিযোগ করতে থাকেন। এমনকি সান্ত্বনার সৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ কথাগুলিও তাদের দুঃখ বা ভয় হ্রাস পারে না। তবুও, যারা আল্লাহর নিখুঁত জ্ঞানের উপর আস্থা রাখে তারা কিছুটা স্বস্তি পায়। তারা বিশ্বাস করে যে, কেউ ধৈর্যশীল হোক বা অধৈর্য, ফলাফল একই হয়ে থাকে। কিন্তু অধৈর্য হল কেবল যন্ত্রণাই বৃদ্ধি পায়। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে প্রকৃত শান্তি আসে। আর যারা ধৈর্য ধারণ করে তারা তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করে।

ধৈর্যের মধ্যে বিরাট প্রতিদান রয়েছে। অন্যদিকে অধৈর্যকে নৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত। পার্থিব জীবনের প্রকৃতি বা নিয়মই হচ্ছে ক্রমাগত পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়া। ঐশ্বরিক পরিকল্পনায়, স্রষ্টা তাঁর ধর্মের অংশ হিসেবে আশীর্বাদ (নেয়ামত) প্রদান করেন এবং ত্যাগ করেন। তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়বিচারের পূর্ণ উপলব্ধি কেবল পরকালেই স্পষ্ট হবে। ধর্ম আরামের সময় সংযম এবং বঞ্চনার সময় ধৈর্যর সবক শেখায়। যারা এই নীতি অনুসারে জীবনযাপন করে তাদের সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কুরআন এই সত্যকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে: ''নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব। কিন্তু ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও - যারা বিপদে পড়লে বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব।' 'তাদের উপর তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আশীর্বাদ ও করুণা রয়েছে। এবং তারাই সঠিক পথপ্রাপ্ত।'' (কুরআন ২: ১৫৫-১৫৭)

যারা এই ঐশ্বরিক বাস্তবতা গ্রহণ করে তারা শান্ত ও নির্ভীক থাকে। তারা তাদের ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকে। পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে থাকুক বা প্রতিকূল হোক না কেন, এটা তাদের বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে না। তারা মনে যে, শোক, উদ্বেগ এবং অভিযোগ ভাগ্য পরিবর্তন করে না। যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করার

পরিবর্তে, তারা ঐশ্বরিক করুণা, দোয়া থেকে শক্তি খুঁজে নেয়। এবং নতুন উদ্যমে নতুন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে জীবনের নতুন পথচলা শুরু করে। গতকালের ক্ষতিই আজকের প্রচেষ্টার জন্ম দেয়। এইভাবে, প্রকৃত বিশ্বাস অভ্যন্তরীণ শান্তির উৎস এবং উৎপাদনশীল কর্মের জন্য অনুঘটক হয়ে উঠে। উল্টোদিকে, ভাগ্য সম্পর্কে ত্রুটিপূর্ণ ধারণা নিষ্ক্রিয়তা এবং কর্মহীনতার দিকে পরিচালিত করে - যা ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

প্রাকৃতিক জগতের মতোই মানুষের জীবনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও কষ্ট, আলো ও অন্ধকার, তাপ ও ঠান্ডা, উঁচু চূড়া এবং গভীর উপত্যকা উভয়ই রয়েছে। জ্ঞানী তারাই যারা ভারসাম্য এবং স্থিতিশিলতা উভয়ের সাথেই এগিয়ে যায়। কখনও কখনও, কষ্টগুলি অবিরাম বলে মনে হয়। এমনকি দয়ার কাজও নিষ্ঠুরতার সাথে প্রতিদান দেওয়া যেতে পারে। তবুও পরকালে মুক্তির আশা মনে শক্তি দেয়। প্রতিটি পরীক্ষাই স্রষ্টার ইচ্ছার অংশ। আর এই জ্ঞান তাক সান্ত্বনা দেয়। কেউ যা কিছু পায়, তা সৃষ্টিকর্তার আদেশেই হয় । সেই উপলব্ধিতেই প্রকৃত শান্তি নিহিত আছে।

যারা নিজেদের চেয়ে কম ভাগ্যবানদের যত্ন নেয় বা খেয়াল করে তারা প্রায়শই গভীর সন্তুষ্টির অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকে। তারা তাদের প্রাপ্ত আশীর্বাদগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং সেগুলিকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে মনে করে। অন্যদের লড়াই-সংগ্রাম ও যন্ত্রণা বোঝার মাধ্যমে, তাদের নিজস্ব অসুবিধাগুলি ছোট এবং অধিক সহনীয় বলে মনে হয়। এই কারণেই নবী (সাঃ) আমাদেরকে পার্থিব বিষয়গুলির দিক দিয়ে আমাদের তুলনায় নীচের লোকদের দেখার পরামর্শ দিয়েছেন, উপরের দিক থেকে নয়।

পবিত্রতার পথ

বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা আবশ্যিকরূপে নৈতিক বা আধ্যাত্মিক সততার জীবনযাপনের দিকে পরিচালিত করে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বৌদ্ধিক কৃতিত্ব এবং নৈতিক চরিত্রের মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত যোগসূত্র নেই। প্রকৃত পবিত্রতা জাগতিক সাফল্য থেকে উদ্ভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে,

যারা তাদের বুদ্ধি বা কৃতিত্বের জন্য প্রশংসিত হয়, তাদের অনেকেই নৈতিকভাবে আপোষ করে নেয় জীবনে।

পল জনসনের লেখা Renowned Intellectuals (হার্পার অ্যান্ড রো পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক) বইটিতে রুশো, শেলি, মার্কস, ইবসেন, টলস্টয়, হেমিংওয়ে, বার্ট্রান্ড রাসেল, ব্রেখ্ট এবং সার্ত্রের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিগত জীবন বিস্তারিতভাবে অন্বেষণ করা হয়েছে। বইটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উদাহরণস্বরূপ, টলস্টয় কীভাবে একটি ডায়েরি লিখতেন যা তার গভীর সমস্যায় ভরা ব্যক্তিগত জীবন প্রকাশ করত। তার স্ত্রী তার ডায়েরি পড়ার পর, পতিতালয়ে ভ্রমণ, পতিতা, জিপসি, দাসী নারী এবং এমনকি পারিবারিক বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের বিরক্তিকর ঘটনাবলী জানতে পারেন। এটা তাকে গভীরভাবে আঘাত করে এবং একজন নীতিবান চিন্তাবিদ হিসেবে তার ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করে। লেখক তাকে 'যৌন দানব' বলে অভিহিত করেছেন!

বিখ্যাত নাট্যকার ব্রেখ্ট, অনেক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন বলেও জানা যায়। আগের সম্পর্ক থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। লেনিনের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছিলেন যে, সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিদের জীবন দেওয়া যেতে পারে - কিন্তু প্রায়শই মৌলিক মানবিক শালীনতা উপেক্ষা করা হয়। নারীদের প্রতি জিন-পল সার্ত্রের মনোভাবও একই রকম উদ্বেগজনক ছিল। তার আচরণ, বিশেষ করে তরুণীদের প্রতি, ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছে এবং গভীরভাবে নারী-বিদ্বেষ প্রকাশ করে। সার্ত্রের জীবন ছিল প্রকাশ্য অশ্লীলতায় মোড়া। এটা তিনি গোপন করেননি বা তার জন্য অনুশোচনা করেননি।

মানবজাতি অসাধারণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিজ্ঞান কল্পনারও বাইরে পৌঁছেছে। প্রযুক্তি দ্রুত গতিতে বিকশিত হয়েছে। জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। সভ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে। জীবনযাত্রার মান অভূতপূর্ব উন্নতি দেখেছে। তবুও, এই সমস্ত অগ্রগতি সত্ত্বেও, মানুষ নিজেই অপরিবর্তিত রয়েছে। সহিংসতা, অবিচার, শোষণ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, মাতালতা, ব্যভিচার, কুসংস্কার এবং অন্যান্য সমস্ত ধরণের মন্দ অতীতে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গিয়েছে। মূলত

আরাম আয়েশ ও বিলাসিতা কেবলই এ সব অপকর্মের দিকে ঠেলে দিয়েছে অর্থাৎ অপকর্মের বিস্তীর্ণ ময়দান খুলে দিয়েছে।

সময় বদলেছে। বদলেছে পৃথিবী। কিন্তু এই পরিবর্তন নিছকই বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণভাবে, মানুষ তখন, এখন এবং সম্ভবত চিরকাল একই থাকে। তার মন বস্তুগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি। তাই, প্রকৃতপক্ষে, কোনও মৌলিক রূপান্তর ঘটেনি। বিগত শতাব্দীর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত এবং উন্নত করেছিল এমন আদর্শই প্রকৃত পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে। সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে সচেতনতা একটি রূপান্তরকারী চালিকাশক্তি। যখন এই বিশ্বাসগুলি একজন ব্যক্তির মনে শিকড় গেড়ে বসে, তখন তারা জীবনের প্রতি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনরূপে সাজিয়ে নেয়। জীবন পবিত্র হয়ে উঠে। ব্যক্তিরা উন্নতি করতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, সমাজ আরও পরিশীলিত হয় এবং জাতি আরও নিরাপদ হয়।

স্রষ্টা আমাদের অন্তরের অনুভূতি, চিন্তা-ভাবনা, কথা এবং কাজ সম্পর্কে অবগত এবং পরকালে আমরা সেই অনুযায়ী পুরষ্কার বা শাস্তির মুখোমুখি হব, এই দৃঢ় বিশ্বাস একজন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। এই বিশ্বাস মানুষের জীবনযাত্রায় গভীর পরিবর্তন সাধন করে। পাপের গভীরে একবার হারিয়ে যাওয়া জীবন আন্তরিক বিশ্বাসের পানিতে পরিশুদ্ধ হয়। এই বিশ্বাস প্রলোভন প্রতিরোধ করার শক্তি প্রদান করে। মদ্যপান বা মাদকাসক্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা খুঁজে পায়। ব্যভিচারী অনৈতিকতা থেকে দূরে সরে যায়। চোর প্রতারণা ত্যাগ করে। দুর্নীতিগ্রস্তরা সৎ হয়। নিষ্ঠুররা করুণা দেখায়। কাপুরুষ হয়ে উঠে সাহসী। যদিও মন্দ এড়ানোর অনেক কারণ থাকতে পারে, কেবল প্রকৃত বিশ্বাসই জীবনের প্রতিটি দিককে পরিশুদ্ধ করতে পারে।

ইসলাম সকলের

স্রষ্টা তাঁর শেষ রসূলের (বার্তাবাহক) মাধ্যমে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে - ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক - সম্পূর্ণ এবং সুসংহত পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন। মুসলিমরা হলেন

তারা যারা এই ঐশী নির্দেশনা অনুসারে জীবনযাপন করেন। যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম হওয়া কোনও নির্দিষ্ট জাতি, জাতীয়তা বা ভাষার সাথে সম্পর্কিত বিষয় নয়। এটি কোনও জাতি বা অঞ্চলের নাম নয়, অথবা এটি কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। একজন মুসলিম হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক আইনকে স্বীকৃতি দেন এবং একই স্রষ্টা দ্বারা অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থা অনুসারে জীবনযাপন করেন। আর এইভাবে জীবনযাপন করাকেই ইসলাম বলা হয়। ইসলাম মানবতার কাছে তিনটি মৌলিক নীতি উপস্থাপন করেছে: মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ আইন অনুসারে জীবনযাপন করা। যারা তা করে তাদের মৃত্যুর পরে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। অবাধ্যতার পরিণতিগুলি বুঝুন: যে কেউ জেনেশুনে স্রষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করে, অহংকার করে জীবনযাপন করে এবং অনুতাপ না করে পাপ করে, তা হলে সে পরকালে নরকের আগুনের মুখোমুখি হবে। স্রষ্টার সমস্ত রসূলদের (বার্তাবাহক) উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন, যারা একই অপরিহার্য বার্তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছে শেষ নবী, নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে গ্রহণ করা এবং তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত ঐশ্বরিক নির্দেশনা অনুসরণ করা। এই বিশ্বাস আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করতে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে একটি পবিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করতে আহ্বান জানায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রয়োজন, তাঁর অসংখ্য আশীর্বাদের (নেয়ামত) প্রতি কৃতজ্ঞতার আন্তরিক প্রকাশ হিসেবে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী যিনি এইভাবে জীবনযাপন করেন তিনি নিজের জন্য, তার পরিবার, তার সমাজ, তার জাতির জন্য এবং পরিণামে সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণের উৎস হয়ে ওঠেন। এইভাবে ইসলাম মানুষের আত্মায় শান্তি, ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা এবং পারিবারিক কাঠামোতে স্থিতিশীলতা আনে। এটি সমাজে সম্প্রীতি, জাতির জন্য সমৃদ্ধি এবং বিশ্বজুড়ে শান্তির পরিবেশ গড়ে তোলে। সর্বোপরি, এটি পরকালে মুক্তি নিশ্চিত করে - একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্তার শাস্তি থেকে রক্ষা করে এবং তাকে তাঁর চিরন্তন পুরস্কার: জান্নাত প্রদান করে।

ইসলাম কোনও ভাষা, জাতি বা জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় নয়। এটা সমগ্র মানবতার জন্য একটি সার্বজনীন পথ, যেমন সূর্যের আলো সকলের উপর পতিত

হয়, যেমন পরিস্কার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ। মৃদু বাতাসের মতো যা সকলকে স্পর্শ করে, বৈষম্য ছাড়াই। এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক ঈশ্বরের এক আশীর্বাদ ও উপহার। এটা একটি ঐশ্বরিক জীবন ব্যবস্থা, যা মানুষের হস্তক্ষেপ, পরিবর্তন বা সংযোজন থেকে মুক্ত ও অস্পৃশ্য। গভীর বিনয়ের সাথে আমরা আপনাকে এই আদর্শ অধ্যয়ন, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যা বিশ্বজগতের প্রভুর কাছ থেকে এসেছে। এখানে যা উপস্থাপন করা হয়েছে তা ইসলামের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা বিস্তৃত অধ্যয়ন নয়। এর উদ্দেশ্য কেবল আপনার মধ্যে আগ্রহ জাগানো, আপনাকে সত্যের এই পথটি অন্বেষণ, শেখা এবং বুঝতে উৎসাহিত করা মাত্র। আমরা আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বার্তাটি সেই মহৎ সাধনার দিকে একটি ছোট পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে।

জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর সত্য ও পবিত্র পথ খুঁজে নেওয়ার তৌফিক দিন। তিনি আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করতে সাহায্য করুন, যাতে আমরা মনের শান্তি, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্রতা, আমাদের পরিবারের মধ্যে স্থিতিশীলতা ও সম্প্রীতি, আমাদের সম্প্রদায়ে শান্তি, আমাদের জাতির নিরাপত্তা এবং বিশ্বজুড়ে শান্তি অর্জন করতে পারি। এবং সর্বোপরি, তিনি আমাদের চিরস্থায়ী পুরস্কার - মৃত্যুর পর জান্নাত দান করুন। আমরা যেন এই জীবন এবং পরকালে উভয় জীবনেই সাফল্য অর্জন করতে পারি। আমিন!

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

লেখক পরিচিতি

শেইখ মুহাম্মাদ কারাকুন্নু

একজন স্বনামধন্য ইসলামী পণ্ডিত ও লেখক, শেইখ মুহাম্মাদ কারাক্কুনু বাইথু জাকাত কেরালার চেয়ারম্যান, সালওয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এবং কেরালা মুসলিম হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান।

তিনি জামাআতে ইসলামী হিন্দের (JIH) কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য এবং কেরালা রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্যও।

তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ডায়ালগ সেন্টার কেরালার পরিচালক, ইসলামিক এনসাইক্লোপিডিয়ার ডিরেক্টর, JIH কেরালার সহকারী আমির, প্রবোধনম সাপ্তাহিকের প্রধান সম্পাদক এবং মধ্যমম দৈনিকের উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। তিনি ২৯ বছর ধরে ইসলামিক পাবলিশিং হাউসের (আইপিএইচ) পরিচালক ছিলেন।

ফারুক রৌদাতুল উলুম অ্যারাবিক কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর, তিনি কালিকটের Language Teachers Training Centre থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি এদাভান্না ইসলাহিয়া ওরিয়েন্টাল হাই

স্কুলে ৯ বছর শিক্ষকতা করার পর মালাপপুরম জেলার মোরাইউর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

১৪টি অনূদিত রচনা সহ ১০০টিরও বেশি বইয়ের লেখক তিন। তিনি ৫টি পুরষ্কার পেয়েছেন। অনুবাদের জন্য তিনি ২০১৯ সালে Sheikh Hamad International Translation Award of Qatar এবং ২০১৮ সালে সামাজিক কাজের জন্য K. Karunakaran পুরস্কার পেয়েছেন।

তাঁর সাতটি বই ইংরেজিতে, ছয়টি তামিলে, ১২টি কন্নড় ভাষায় এবং একটি মারাঠিতে অনূদিত হয়েছে।

একজন অসাধারণ বক্তা হিসেবে, তিনি ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং ঐশ্বরিক ধর্মের (ইসলাম) বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে চলেছেন। তিনি কেরালায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপেও অনন্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিনি দোহায় ৭ম আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং দুবাইতে আন্তর্জাতিক কুরআন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শেইখ মুহাম্মাদ ১৯৫০ সালের ১৫ জুলাই কেরালার মাঞ্জেরির কাছে অবস্থিত কারাক্কুনু গ্রামে পুলথ পরিবার মুহাম্মাদ হাজী এবং আমিনার পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন।

স্ত্রীঃ আমিনা উম্মু আয়মান। সন্তান: আনিস মুহাম্মাদ, ডাঃ আলিফ মুহাম্মাদ, ডাঃ বাসিমা, আয়মান মুহাম্মাদ।

নোট

নোট

যুবপ্রত্যাশা প্রকাশনী

১৪ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, ২য় তল, কলকাতা - ১৬
যোগাযোগ - ০৩৩ ২২৬৪ ৫৯৫২